মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-১, সংখ্যা-৬

জুলাই ২০১২ইং, শা'বান ১৪৩৩হি: شعبان المعظم ١٤٣٣هـ، يوليو٢٠١٢م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাওঃ নাসির উদ্দীন

বিনিময়: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা - ১০,০০০(দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী,
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল: monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েভ :http://monthlyalabrar.wordpress.com/

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ৬
পবিত্র সুন্নাহ থেকে ৯
দরসে ফিক্বহ ১২
মুফতী শাহেদ রহমানী
মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত ১৫
হাফেজ মাওলানা এমরান
মাল্টি লেভেল মার্কেটিং- শরীয়তের দৃষ্টিতে-৪..... ১৭
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
জ্ঞান ও ইলম : একটি পর্যালোচনা..... ২১
মাওলানা কাজী ফজলুল করিম
মোবারক হো মাহে রমাজান..... ২৩
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
তাসহীহে কুরআনের অপরিহার্যতা..... ২৬
মাওলানা ক্বারী জসীমুদ্দীন
সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)..... ৩১
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৪
শরয়ী বিধান পরিপালনে ফিকহ শাস্ত্রের অনিবার্যতা-৩ ... ৩৯
মাওলানা মুফতী মাসূম
প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি..... ৪২
মাওলানা হুযায়ফা দস্তানভী
উদীয়মান কাফেলা ৪৫
তারানা ৪৭
খবরাখবর ৪৮

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮১২৩৫৭৫২২
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৮৩১৭৪০৫৪০

সম্পাদকীয়

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নাফস ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়

'জেনে রেখো, মানুষের দেহের মধ্যে এক খণ্ড মাংশপিণ্ড আছে, যখন তা সংশোধিত হয়, তখন সমগ্র দেহ সংশোধিত হয়ে যায়। আর যখন তা দূষিত হয়, তখন সমগ্র দেহটাই দূষিত হয়ে যায়। মনে রেখো সেটাই ক্বলব।' (বোখারী ও মুসলিম শরীফ ৩/১২২০ হাদীস নং ১৫৯৯)।

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নাফস-এর অর্থ হলো আত্মাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা। বাহ্যিক বিষয়ের ন্যায় আত্মিকভাবেও অসংখ্য পঙ্কিলতা বিদ্যমান। বাহ্যিক বিষয়ে যেমন যেনা, সুদ-ঘুষ, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, রাহজানী, দুর্নীতি, খুন-খারাবি, গীবত ইত্যাদি পাপ ও হারাম কাজ। তেমনি আত্মিকভাবেও মানুষের অনেক হারাম বিষয় ও পাপ পঙ্কিলতা রয়েছে। যেমন বাহ্যিক বিষয়ে যেগুলো পাপ অন্তরে সেগুলোর চিন্তা করা, পরিকল্পনা করাও পাপ। এর বাইরেও কিবির, উজব, রিয়া, বুগজ তথা অহংকার, আত্মগৌরব, লোকদেখানোর নিয়্যাত, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির বিভিন্ন অবৈধ চাহিদা, বদগুমানী ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তর বা কলবের পাপ পঙ্কিলতা।

যেহেতু মানুষের বাহ্যিক যে কোনো কাজের মূল পরিকল্পক কলব, নফস বা আত্মা সে কারণে বাহ্যিক আমল তথা নামায রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলি যেমন মানুষকে পালন করতে হয়, তদ্রুপ চিন্তা জগতের পাপ পঙ্কিলতা বিদূরিত করে সে স্থলে ইখলাস, তাকওয়া, সবর, শোকর ইত্যাদি অর্জনের জন্যও শরীয়তের রূহানী বিধান পালন করতে হয়। সে বিধানাবলির চর্চা এবং সেমতে আমল করার নামই হলো আত্মশুদ্ধি। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দুনিয়াতে প্রেরণের যে সকল উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধিও একটি স্বতন্ত্র মুখ্য বিষয়।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يتلو عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم-

"তিনি তাদেরকে আপনার কিতাব তেলাওয়াত করে শোনাবেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি করবেন।"(সূরা বাকারা ১২৯)

মানুষের সমস্ত কাজের মূল পরিকল্পক ক্বলব-আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের সর্ব বিষয় দেখেন, সর্ব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। তবে আল্লাহ পাক দেখতে চান ওই লোকের অন্তর কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে? ভালোর দিকে, নাকি খারাবির দিকে। সে যদি অন্তরে খারাপ নিয়্যাত রেখে বাহ্যিকভাবে যে কোনো ভালো কাজও করে আল্লাহর কাছে তা কবুল হয় না।

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস–

انما الاعمال بالنيات "আমলের মূল ভিত্তি নিয়্যাতের ওপর।"

অর্থাৎ কোনো ভালো আমলও কবুল হওয়া না হওয়া নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। তাহলে বোঝা যায় মানুষের বাহ্যিক আমল কবুল হওয়া না হওয়ার সাথে আত্মার পরিশুদ্ধিই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ক্বলব বা মনোজগতের তুলনায় মানুষের বাহ্যিক আমলের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কুচিত। মানুষ এক মিনিটে বাহ্যিক যা আমল করতে পারে তার অসংখ্য গুণ বেশি ভাবতে পারে। মনোজগত, চিন্তাজগত, নাফস, ক্বলবের এই বিশাল জগতকে যে একমাত্র আল্লাহ ও রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারে। সে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই পারে দুনিয়াতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে। সে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই দুনিয়াতে সকল ভালোকাজ হক পথে আঞ্জাম দিতে পারে। মূলত এই নিয়ন্ত্রণকেই বলে আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া। এদের জন্য রয়েছে দুনিয়া আখেরাতে অসংখ্য নিয়ামতের ঘোষণা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

قد افلح من زكها

"নিশ্চয় সে সফলকাম যে আত্মাকে পরিচছন্ন করেছে।"(সূরায়ে শামস ৯)

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

সেদিন (কিয়ামতের দিন) অর্থ সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সে ব্যক্তি ব্যতীত যে সুস্থ বা পরিচ্ছন্ন কৃলব নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। (সূরা শু'আরা ৮৮-৮৯)

ومن يؤمن بالله يهد قلبه

যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। (সূরা-আত তাগাবুন-১১)

اولئك كتب فى قلوبهم الايمان

তাদের কৃলবে (অন্তর বা মনে) আল্লাহ ঈমানকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন।(সূরা মুজাদালাহ-২২)

ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কৃলবে (অন্তর বা মনে) ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। (সূরা-হুজুরাত-৭)

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم

যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের কৃলব (অন্তর বা মন) (সূরা-আনফাল-২)

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔

অতঃপর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বুক ইসলামের জন্য উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বুক সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এই রূপে লাঞ্ছিত করেন (সূরা-আনআম-১২৫)।

সেরূপ যাদের আত্মা পরিশুদ্ধ নয় বা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور

মূলত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বস্তুত কৃলবই (অন্তরই) অন্ধ হয়। (সূরা-হাজ্জ-৪৬)

طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون

মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের কৃলব (অন্তর) সমূহের ওপর। বস্তুত তারা বোঝে না। (সূরা-আত-তাওবা-৮৭)

وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون

আর আল্লাহ তা'আলা মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের কৃলব (অন্তর বা মন) সমূহে। বস্তুত তারা জানতেও পারেনি। (সূরা-আত-তাওবা-৯৩)

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

বস্তুত আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের কৃলব (অন্তর বা মন) সমূহের ওপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না। (সূরা-আরাফ-১০০)

পবিত্র হাদিস শরীফে আছে, "জেনে রেখো, মানুষের দেহের মধ্যে এক খণ্ড মাংশপিণ্ড আছে, যখন তা সংশোধিত হয়, তখন সমগ্র দেহ সংশোধিত হয়ে যায়। আর যখন তা দূষিত হয়, তখন সমগ্র দেহটাই দূষিত হয়ে যায়। মনে রেখো সেটাই কৃলব।"(বোখারী ও মুসলিম শরীফ ৩/১২২০ হা.নং ১৫৯৯)

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের শরীর বা আকৃতির দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের কৃলবের (মন বা অন্তর) দিকেই তাকান।" অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কৃলবকে দেখানোর জন্য স্বীয় আঙুল দ্বারা নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন (মুসলিম শরীফ ৪/১৯৮৭ হা. নং ২৫৬৪)

রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, 'মানুষের কৃলব আল্লাহ পাকের অতুলনীয় ও অলৌকিক দুই আঙুলের মাঝখানে। তিনি অন্তর সমূহকে (কৃলব) যেমন ইচ্ছা তেমনি করে দেন ।"

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করার সময় রসূলে পাক(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, "হে অন্তরের (কৃলব) আবর্তন ও বিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের কৃলবকে তোমার অনুগামী করে দাও।"

কৃলব সম্পর্কে রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, "কৃলব হলো সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাদশা।" (মেরকাত ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২)

অন্য এক হাদিসে আছে, মানুষ যখন কোনো পাপ কাজ করে তখন তার কৃলবের মধ্যে কালি পড়ে যায়।

অন্য হাদিসে আছে, শয়তান প্রতিটি মানুষের কৃলবের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। যখন সে যিকির শুরু করে তখন সে পালিয়ে যায়। আবার যখন আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হয় তখন শয়তান আবার কৃলবে ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দিতে থাকে।

কয়েকটি কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ এখানে উল্লেখ করা হলো। যা থেকে বোঝা যায়, মানুষের কৃলবের রাজত্ব বিশালায়তন, কৃলবের পরিচ্ছন্নতা আল্লাহর নৈকট্য লাভের

মোক্ষম পথ, ক্বলবের অপরিচ্ছন্নতা মানুষকে কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায় ইত্যাদি বিষয়।

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মানুষের ক্বলব বা অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্যও পাঠিয়েছেন। ক্বলবের পরিশুদ্ধির অর্থ হলো যাবতীয় শয়তানি ওয়াসওয়াসা, পাক-পঙ্কিলতা ক্বলব থেকে দূর করে ঈমান, ইখলাস, সবর, শোকরসহ যাবতীয় ভালো চিন্তাকে ক্বলবে স্থান দেওয়া। সেগুলোর ওপরই অন্তর পরিচালিত হওয়া।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে সর্বাধিক আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দিতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিটি শিক্ষায় আত্মশুদ্ধি নিহিত রয়েছে। পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে هدى للمتقين আল্লাহ ভীরু মানুষের হেদায়াতস্বরূপ। তাকওয়া বলা হয় খোদাভীতিকে। সে ভীতির সম্পর্ক ক্বলবের সাথে। খোদাভীতি প্রকাশ পায় আমলের মাধ্যমে। ঈমান এবং ইসলামের পূর্বশর্ত হলো নাফস বা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া।

তাহলে বোঝা যায়, আত্মশুদ্ধি ঈমানের সাথে সম্পর্ক, তাকওয়ার সাথে সম্পর্ক, আমল সঠিক হওয়ার সাথে সম্পর্ক, আমল কবুল হওয়ার সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এক কথায় বলা যায়, দুনিয়া আখেরাতে সফলকাম হওয়ার জন্য অন্যতম পথ হলো আত্মার পরিশুদ্ধি, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, আত্মার পবিত্রতা।

এই আত্মশুদ্ধি তথা তাযকিয়ায়ে নফসকে আমাদের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক সাধনা বলা হয়। তাসাউফ, তরীকত, সুলুক এবং ইহসান ইত্যাদি শব্দগুলো একই অর্থ তথা আত্মশুদ্ধির পথের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণ যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় জাহেরী বিষয় ও আমল কুরআন ও হাদীস থেকে সংকলন করে মুসলমানদের সুবিধার্থে সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপন করেছেন, তেমনি তাসাউফের ইমামগণ আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কুরআন হাদীস থেকে বিভিন্ন বিষয় সংকলন করে সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপন করেছেন। জাহেরী ইলম অর্জনের জন্য যেমন তাফসীর, হাদীস, ফিকহের অসংখ্য কিতাবাদী লেখা হয়েছে। রূহানী ইলম অর্জনের জন্যও বহু কিতাবাদী লেখা হয়েছে। জাহেরী ইলম অর্জন করতে যেমন উস্তাদের সান্নিধ্যে বসতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্যও উস্তাদের সুহবতে সময় দিতে হয়। কোনো ধরনের ইলম উস্তাদ ব্যতীত অর্জন করা যায় না। জাহেরী ইলমের উস্তাদগনকে স্তর হিসেবে যেমন এক একটা উপাধিতে ভূষিত করা হয়, সেরূপ রূহানী ইলমের উস্তাদদেরকেও বিভিন্ন উপাধি দেওয়া হয়। বাহ্যিক ইলমের উস্তাদকে বলা হয় উস্তাদ, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, বলা হয় ইসলামী চিন্তাবিদ, মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীস, সদরুল মুদাররেসীন, বাংলাতে অধ্যাপক, প্রভাষক, ডক্টর, লেকচারার। এসব নাম হলো পদমর্যাদা, সম্মান ইত্যাদিভিত্তিক পরিচায়ক। তেমনি আধ্যাত্মিক ইলমের উস্তাদদেরকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, পীর, শায়খ, স্তর বিশেষে গাউস, কুতুব, আবদাল ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বিভিন্ন লোক বিভিন্নস্তরের কৃতিত্ব অর্জন করে। তার কৃতিত্ব ও সফলতার স্তর হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। যে লোক যে স্তরে পৌঁছে যায় তাকে সে নামেই পরিচয় দেয়া হয়।

হাদীস শরীফ, ফিকহ বা অন্যান্য বিষয়ে ছাত্ররা একটি স্তরে পৌঁছে গেলে তাকে উস্তাদের পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তুমি এটির যোগ্য হয়েছ, সুতরাং তুমি এখন থেকে আমার সূত্রে অন্যকে হাদীসের শিক্ষা দিতে পারবে, আমার সনদে তুমি অন্যকে শরীয়তের মাসআলা বলতে পারবে এভাবে এজাযত বা অনুমতি দেয়া হয়। তেমনি আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পথের ছাত্রগণ এক একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছার পর উস্তাদগণ তাদের অনুমতি দেন যে, তুমি আমার সনদে বা আমার সূত্রে অন্যকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে পারবে। এটিকে সুলুকের পরিভাষায় খেলাফত বা ইজাযত প্রদান বলা হয়।

এই হলো দুনিয়াতে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ইসলামী শিক্ষার নিয়ম পদ্ধতি। সেটা বাহ্যিক শিক্ষা হোক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা। ইসলামের ইতিহাসে এও দেখা যায় যে, বাহ্যিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রায় সমান্তরালভাবেই চলে এসেছে। যারাই হক্কানী আলেম ছিলেন তাঁরা আবার আধ্যাত্মিক শিক্ষায়ও উঁচুমানের উস্তাদ ছিলেন। তাঁরা যেমন কুরআন হাদীসের ইলম বিতরণে মুসলিম উম্মাহের মধ্যে দ্বীনের নূর ছড়িয়েছেন, তেমনি তাঁদের রূহানী শিক্ষা দ্বারা পুরো উম্মতকে আলোকিত করেছেন।

যত দিন পর্যন্ত নববী শিক্ষার এই ধারা তথা বাহ্যিক শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যাপক চর্চা উম্মতের মধ্যে ছিল, তত দিন মুসলমানদের শান-মান, ইজ্জত আব্রু এবং কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। ক্রমান্বয়ে আত্মশুদ্ধির পথ থেকে মুসলমানগণ সরে যাওয়ায় তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, রূহানী স্প্রিট হ্রাস পায়। নীতি-নৈতিকতায় বিপর্যয় ঘটে,

ঈমানের মজবুতী হ্রাস পায়, তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর ইত্যাদি গুণ ক্রমান্বয়ে কমে যেতে থাকে, মোট কথা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ قد افلح من زكها তথা তাযকিয়াকারী এবং কুরআনের ভাষায় بقلب سليم সুস্থ ক্বলবের লোক যখন থেকে হ্রাস পেতে থাকে তখন থেকে মুসলমানদের অধঃপতন আরম্ভ হয়।

মুসলমানগণ যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মূল শিক্ষা কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নফসের কাজে আত্ম নিয়োগ করে নিজেদের মন ও মননকে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অবারিত করতে সক্ষম হয় ইনশাআল্লাহ মুসলিম উম্মাহ অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে অনেকাংশে অতি সহজে রক্ষা পেতে পারেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপমহাদেশে তৎকালীন যত বড় বড় উলামায়ে কেরামের মেহনত ও শ্রমের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত ইলমে নববী পৌঁছেছে তাঁদের সকলে বড় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিও ছিলেন। ইলমে নববী ও আধ্যাত্মিক জগতে যুগের সম্রাট হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর বাগানের সর্ব শেষ পুষ্প মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী (রহ.)-এর খলীফা এ দেশের শীর্ষ আলেমে দ্বীন ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম) বাহ্যিক শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষা চর্চার ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতি অটুট রাখার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় খানেকাহ পদ্ধতি চালু রেখেছেন। এর অধীনে ছাত্রদের জন্য নিয়মিত তারবীয়াতী ও আত্মশুদ্ধিমূলক প্রোগ্রাম যেমন বাস্তবায়িত হয় তেমনি প্রতি আরবী মাসের শেষ সপ্তাহে বিষ্যুদবার মাসিক ইসলাহী ইজতিমা এবং প্রতি হিজরী বর্ষে রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহের বিষ্যুদ ও জুমাবার উলামায়েকেরামের ইসলাহী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদরাসাসমূহের শত শত উলামায়েকেরাম তাযকিয়ায়ে নাফস ও আত্মশুদ্ধিমূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য যোগ দিয়ে থাকেন।

পবিত্র রমজান মাস আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসে সিয়াম সাধনার পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির মেহনতে অংশ নিতে পারলে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের যে উদ্দেশ্য তা সহজে হাসিল হয়। তাই হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) ১৬ বছর থেকে প্রতি রমজান মাসে খানেকাহে ১৫ দিনব্যাপী বিশেষ এসলাহী ইজতিমার ব্যবস্থা করে এসেছেন। এই এসলাহী ইজতিমায়ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা শত শত উলামায়ে কেরাম যোগ দিয়ে থাকেন। যাঁদের মধ্যে দেশের বড় বড় মুফতীয়ানে কেরাম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মাদরাসার মুহতামিম, নাযেমে তা'লিমাত, শিক্ষক প্রমুখ রয়েছেন। আবার তালেবে এলমদের জন্য আয়োজন করা হয় বিশেষ তাদরীবী কোর্স। তাদরীবী কোর্সে তাসহীহে কুরআন, নাহু, সরফ, ফেরাকে বাতেলা ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি তাদের তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধির জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবছর প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি উলামায়ে কেরাম ও ছাত্রের এই সমাগম শেষ রাত্রের কান্নাকাটি, আল্লাহর জিকিরের ধ্বনি, তাজবীদ সহকারে কুরআন তেলাওয়াত এবং ইসলাহী বিভিন্ন বয়ানে যেন পুরো মারকাযকে মুখরিত করে।

মুসলিম উম্মাহের আধ্যাত্মিক শক্তির মূল চালিকাশক্তি তাযকিয়ায়ে নাফসের শিক্ষা প্রশিক্ষণ থেকে উম্মাহকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেই এমন লোক তৈরি করা হয়েছে যাদের পক্ষ থেকে বলা হয় আত্মশুদ্ধি, সুলুক বা তাসাউফ হাদীসের কোথায় আছে? ইসলামে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি বলতে কিছু নেই ইত্যাদি। আরেক প্রকার হলো তাযকিয়ায়ে নাফসের এই পবিত্র নিষ্কলুষ ধারাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এমন কিছু লোক সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা আত্মশুদ্ধি ও তাসাউফের নামে বিভিন্ন বিদ'আত ও শিরিকী কাজের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আরেকটা ষড়যন্ত্রমূলক স্লোগাণ হলো মসজিদ মাদরাসার চার দেয়ালে বসে বসে কি কাজ হবে? এই চিন্তা ধারাতেই জনৈক বাতিলপন্থী লেখেই ফেলল, "রাতে নামায দিনে রোজা, নেই তো এখন সেই সময়, নতুন সাজে সাজরে তোরা করতে হবে বিশ্ব জয়।" নাউজু বিল্লাহ। আরেক জন অতি আবেগী বলেই ফেলল, "আমরা মিছিল করার জন্য রাস্তায় নেমে গেছি আর আপনারা এখনও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইছেন।" নাউজু বিল্লাহ।

মুসলমানদের মূল আধ্যাত্মিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিশূন্য করা এবং তাদেরকে বস্তুবাদী বানানোর দীর্ঘদিনের এই ষড়যন্ত্রের কবল থেকে স্বয়ং মুসলমানদেরকেই বেরিয়ে আসতে হবে। সচেতন হতে হবে মুসলিম উম্মাহকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

قد افلح المؤمنون☆ الذين هم فى صلاتهم خاشعون☆ والذين هم عن اللغو معرضون☆ والذين هم للزكوة فعلون☆ والذين هم لفروجهم حافظون ☆ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين☆ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون☆ والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون☆ والذين هم على صلوتهم يحافظون☆ اولئك هم الوارثون☆ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون☆

"১. মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। ২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। ৩. যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত। ৪. যারা যাকাত দান করে থাকে। ৫. এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। ৬. তবে তারা তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তিরস্কৃত হবে না। ৭. অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যদের কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘণকারী হবে। ৮. এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। ৯. এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে। ১০. তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। ১১. তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকারী লাভ করবে, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (সূরা আলমু'মিনূন আয়াত ১-১০)

যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ওহী নাযিল হত তখন মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হতো। হযরত উমর (রা.) বলেন, একদিন তাঁর কাছে এমনই আওয়াজ শুনে সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শ্রবণের জন্য আমরা থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি দু'আ পাঠ করে বললেন, এক্ষণি দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

সাফল্য কী, কোথায় এবং কিরূপে অর্জন করা যায়?

قد افلح المومنون সাফল্য শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আযান ও একামতে দৈনিক পাঁচ বার প্রত্যেক মুসলমানকে সফলতার দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া। (কামূস) এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোনো মানুষ এর চাইতে বেশি কিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতে কোনো মহৎ ব্যক্তির আওতাধীন নয়। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়। যার নাম জান্নাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ولهم مايدعون "তাঁরা যা চায় তা পাবে।"

তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দুনিয়াতেও দান করে থাকেন। উল্লেখিত সফলতা অর্জনের জন্য আয়াতে বর্ণিত সাতটি গুণে গুণি হতে হবে।

আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণ :

সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম গুণ : নামাযে "খুশু" তথা বিনয়-নম্র হওয়া। খুশুর আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা। এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা। অর্থাৎ অনর্থক নড়া চড়া না করা। বিশেষত এমন নড়াচড়া যা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। ফেকাহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাযের মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে খুশুর এ সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ :

অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা।

والذين هم عن اللغو معرضون - لغو এর অর্থ অনর্থক কথা ও কাজ যাতে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্ন স্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

من حسن اسلام المرأ تركه مالا يعنيه

অর্থাৎ মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করবে তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ যাকাত :

زكوة যাকাত-এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ সম্পদের একটি বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কুরআনে পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা

হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরজ হয়নি। মদীনায় হিজরতের পর ফরজ হয়েছে। ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুজাম্মেল মক্কায় অবতীর্ণ সবাই এবিষয়ে একমত। এই সূরাতেও فاقيموا الصلوٰة এর সাথে واتوا الزكوٰة উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং নিসাব ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থির হয়েছে। যাঁরা যাকাত কে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যও তাই।

যাঁরা বলেন, মদীনায় পৌছার পরই যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এ স্থলে যাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরো ইঙ্গিত রয়েছে। সাধারণত কুরআনে পাকে যেখানে ফরজ যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ايتاء , তথা ويوتون واتوا الزكوٰة ও الزكوٰة বলা হয়েছে। এখানে শব্দ পরিবর্তন করে للزكوٰة فعلون বলা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এ ছাড়া فٰعلون শব্দটি স্বতস্ফুর্তভাবে فعل (কাজ) এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত فعل নয় বরং অর্থ কড়ির একটা অংশ।

চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে হেফাজত করা :

والذين هم لفروجهم حٰفظون الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم۔

"যারা স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামনা বাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

فانهم غير ملومين "যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামনা বাসনা পূরণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজন কে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে। জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত করা যাবে না। অর্থাৎ এটি এরূপ কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কার যোগ্য হবে না।

فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون

"বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়ত সম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামনা বাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ হালাল নয়। যেমন যিনা। সেরূপ হারাম নারীকে বিবাহ করাও যিনার হুকুম। অনুরূপ স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে হায়েয নেফাস অবস্থায় সহবাস করা। অর্থাৎ কোনো বালক কিংবা জীবজন্তুর সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম।

অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন, কুরতুবী ও তাফসীরে মুহীত)

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যার্পন করা :

والذين هم لامٰنٰتهم وعهدهم رٰعون

"আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির ওপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক্ব সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক্ব সম্পর্কিত হোক আল্লাহর হক্ব সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ থেকে আত্মরক্ষা করা।

বান্দার হক্ব সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত তা সুবিধিত, অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যার্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়িত্ব, এ ছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারো কাছে বললে তাও তার আমানত।

শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারো কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করাও আমানতের খেয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতা ক্রমে যে সময় নির্ধারণ করা হয় সেই কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা কর্মচারীর নিকট আমানত। অন্যথায় বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এতে বোঝা গেল যে, আমানত এর হেফাজত ও তার হক্ব আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থ বহন করে।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা :

অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বোঝায়, যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ পরস্পরের জন্য অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ এবং খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা করা হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্য জনকে কিছু দেয়ার অথবা অন্য জনের কোনো কাজ করে দেয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরি ও ওয়াজিব।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে العدة دين অর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব তেমনি ওয়াদা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। শরীয়ত সম্মত উযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ।

উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালাতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে। কিন্তু এক তরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না।

সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া :

والذين هم على صلوتهم يحافظون

নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রূহুল মা'আনী)

এখানে صلوات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে ওয়াক্তের পাবন্দী সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয় ও নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صلوٰة একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ওয়াজিব হোক কিংবা সুন্নাত বা নফল যে নামাযই হোক এর প্রাণ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা বা খুশু খুযূ।

চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব এবং এ-সংশ্লিষ্ট সব বিধিবিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে সে কামেল মুমিন এবং ইহকালে ও পরকালে সাফল্যের হক্বদার।

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণের কথা আরম্ভ করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। তা একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, যে ব্যক্তি নিয়মনীতি সহকারে নামাযের পাবন্দী করবে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি তার অন্তরে সৃষ্টি হতে থাকবে।

اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس

উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী বলা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশও সুনিশ্চিত।

قد افلح বাক্যে সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরো ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

সূত্র : মা'আরেফুল কুরআন, বাহরে মুহীত, কুরতুবী, বয়ানুল কুরআন, মাযহারী ও রূহুল মা'আনী।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএল-এ পাঠানো হয়।
*	জেলা ভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২০% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যে কোন সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	২০০	৩০০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৭২০	৯০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১০৮০	১২০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১২০০	১৪০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	১৭০০
#	আমেরিকা	১৭০০	২০০০

১বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

সম্মানিত গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, রেজিস্ট্রি ডাকই সকল গ্রাহকের জন্য উত্তম। কারণ সাধারণ ডাকে অনেক সময় ঠিকমত পত্রিকা পৌঁছে না।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

তারাবীহর নামায বিশ রাক'আতই পড়তে হবে

তারাবীহর নামায :

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাজান মাসে সর্বদা নিজে তারাবীহর নামায আদায় করেছেন এবং সাহাবায়েকেরাম (রা.) কে পড়ার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছেন। আর কখনও কখনও সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামা'আতের সাথেও তা আদায় করেছেন। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ অনেক কিতাবে সহীহ সনদে বহুসংখ্যক হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত।

তারাবীহর নামায বিশ রাক'আত :

হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তাঁর নির্দেশে সকল সাহাবীর ঐক্যমতের ভিত্তিতে জামা'আতের সাথে বিশ রাক'আত তারাবীহর নামায আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আমল শুরু হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলও বিশ রাক'আত ছিল বলে গ্রহণযোগ্য হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔۔۔

"তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়াত প্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতকে আকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে প্রাণপণ করে কামড়ে রাখবে।" (জামে তিরমিযী ৫/৪৩(২৬৭৩), সুনানে আবু দাউদ ৫/১৪ (৪৬০৭)

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে বিশ রাক'আত তারাবীহই আদায় করা হয়ে আসছে। ইসলামের এই দীর্ঘ ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম কোনো সময় হয়নি।

বিশ রাক'আত তারাবীহ মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত :

عن ابن عباس –رضى الله عنهما– ان رسول الله ﷺ كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر۔

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাজানে বিশ রাক'আত তারাবীহ এবং বিতির আদায় করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৯৩ হাদীস নং ৭৭৭৪, তাবরানী-কাবীর ১১/৩৯৩ হাদীস নং ১২১০২, বায়হাকী-সুনানে কুবরা হাদীস নং ৪৬১৫)

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত :

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তারাবীহ–

১. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর শাসন আমলে সাহাবায়ে কেরাম রমাজান মাসে বিশ রাক'আত পড়তেন।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/২৬১ হা. নং ৭৭৩৩)

২. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী (রহ.)-এর বর্ণনা–

ان عمررضى الله عنه امر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة۔

"হযরত উমর (রা.) জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সাহাবীদের নিয়ে বিশ রাক'আত পড়তে।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৯৩ হা. নং ৭৭৬৪)

৩. তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই (রহ.) বলেন–

كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث

"হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমজান মাসে মদীনা শরীফে লোকদেরকে বিশ রাক'আত পড়াতেন এবং তিন রাক'আত বিতির পড়াতেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৯৩ হা. নং ৭৭৬৬)

৪. হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান (রা.) বর্ণনা করেন–

كان الناس يقومون فى زمان عمربن الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে লোকেরা রমাজানে তেইশ রাক'আত নামায পড়তেন।" (মুআত্তা মালেক ১/১১৪)

৫. হযরত হাসান বসরী (রহ.) বর্ণনা করেন–

ان عمر بن الخطابؓ جمع الناس على ابى بن كعب فكان يصلى لهم عشرين ركعة۔

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মানুষদেরকে উবাই (রা.)-এর পিছনে একত্রিত করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাক'আত আদায় করতেন।" (আবু দাউদ ১/২০২)

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে তারাবীহ :

১. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) বলেন–

كانوا يقومون على عهد عمر فى شهر رمضان بعشرين ركعة۔۔۔ وكانوا يتوكؤون على عصيهم فى عهد عثمان من شدة القيام

"সাহাবী তাবেঈগণ উমর (রা.)-এর যুগে রমাজানে বিশ রাক'আত পড়তেন। আর তাঁরা উসমান (রা.)-এর যুগে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে নিজেদের লাঠিতে ভর করে থাকতেন। (সুনানুল বাইহাকী ২/৪৯৬)

(এতে বোঝা গেল হযরত উসমান (রা.)-এর যুগেও বিশ রাক'আত তারাবীহ হতো। তবে কেরাত খুব লম্বা হতো। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ দেননি)

হযরত আলী (রা.)-এর যুগে তারাবীহ :

১. তাবেয়ী আবুল হাসান (রহ.) বলেন–

ان عليارضى الله عنه امر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة

"হযরত আলী (রা.) এক ব্যক্তিকে রমাজানে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত পড়ার আদেশ দিয়েছেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৯৩ হা. নং ৭৭৬৩)

২. আব্দুর রহমান আসসুলামী হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলেন–

دعى القرآن فى رمضان فامرمنهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة۔

"হযরত আলী (রা.) রমাজানে হাফেযদেরকে ডেকে একজনকে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়ানোর আদেশ দিলেন।" (সুনানুল বায়হাকী ২/৪৯৬)

অন্যান্য সাহাবীগণের আমল বিশ রাক'আত তারাবীহ :

১. উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-এর আমল :

তাবেঈ আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই বলেন :

كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلا ث

"সাহাবী উবাই ইবনে কা'আব (রা.) রমাজানে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত পড়তেন। এর পর তিন রাক'আত বিতির পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৯৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল :

قال الاعمش : كان عبد الله يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث

"আ'মাশ (রহ.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রমাজানে বিশ রাক'আত এবং তিন রাক'আত বিতির পড়তেন।" (কিয়ামুল্লাইল মারওয়াজী ৯১, উমদাতুল ক্বারী ৮/২৪৬, হা. নং ২০১০)

এ ছাড়া অন্য সাহাবীগণ থেকে তারাবীহ'র নামায বিশ রাক'আতই প্রমাণিত। কোনো একজন থেকেও আট রাক'আত তারাবীহর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাবেঈগণের আমল :

১. বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফলাহ (রহ.) -এর আমল : আবুল খাসীব (রহ.) বলেন :

كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان فيصلى خمس ترويحان عشرين ركعة۔

"হযরত সুওয়াইদ বিন গাফলাহ আমাদের নিয়ে রমাজানে ইমামতি করতেন। আর তিনি পাঁচ তারবীহাহ তথা বিশ রাক'আত পড়াতেন।" (এক তারবীহাহ সমান ৪ রাক'আত) (আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২/৪৯৬)

২. হযরত শুতাইর বিন শাকাল (রা.)-এর আমল :

আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস বলেন–

انه كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر

"তিনি (শুতাইর) রমাজানে বিশ রাক'আত এর পর বিতির পড়তেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৯৩)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকাহ (রহ.)-এর আমল :

হযরত নাফে' (রহ.) বলেন :

كان ابن ابى مليكة يصلى بنا فى رمضان عشرين ركعة ويقرأ بحمد الملائكة فى ركعة

"ইবনে আবী মুলাইকা আমাদের নিয়ে রমাজানে বিশ রাক'আত পড়তেন। আর এক রাক'আতে সূরায়ে ফাতির পড়তেন।" (প্রাগুক্ত)

বিশ রাক'আত তারাবীহর ওপর ইজমায়ে উম্মত :

২০ রাক'আত তারাবীহ্ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় থেকে যুগ যুগ ধরে অনবরত চলে আসছে। বিশেষ করে হযরত উমর (রা:)-এর খিলাফত কালে তারাবীহর নামায জামা'আতবদ্ধভাবে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার ফলে পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ আরব-আজম তথা পুরো দুনিয়ায় মুসলমানদের নিকট এ বিষয়টা ব্যাপক ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

কয়েকটি অনির্ভরযোগ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত সর্বত্রই মুসলমানরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তে থাকে বরং এতে সব মুহাজির ও আনসার সাহাবী এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা/ঐক্যমত সংঘটিত হয়।

(ক্বিয়ামুল লাইল, মারওয়াযী ৯০)

২০ রাক'আত তারাবীহর ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্য সাহাবীর কোনো ধরনের আপত্তি কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই।

পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ যুগ যুগ ধরে সর্বত্রই ২০ রাক'আত তারাবীহর নিয়ম চলে আসা-ই এই ইজমার (মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতের) উজ্জ্বল দলিল বহন করে।

এ গুলোকে সামনে রেখে ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) লিখেছেন :

'সাহাবী হযরত উবাই বিন কা'আব (রা.) থেকে এটাই

বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত, এতে সাহাবীগণের কোনো মতানৈক্য ছিল না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২/৩৯৩/৭৬৮৮)
প্রখ্যাত ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেছেন–
"তারাবীহর নামায ২০ রাক'আতের ওপর সব সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (সর্বসম্মত ঐক্যমত) সংঘটিত হয়েছে। (মিরকাত, শরহে মিশকাত-৩/৩৪৬)
বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ক্বাসতালানী (রহ.) লিখেছেন :
'হযরত উমর (রা.)-এর যুগের অবস্থা প্রায় ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্যমতের পর্যায়ে পড়ে। (ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী-৩/৪২৬)
ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুগনীতে লিখেন :
"হযরত উমর (রা.) যা করেছেন এবং যে বিষয়ে সব সাহাবায়ে কিরাম ওই সময়ে ইজমা (সর্বসম্মত ঐক্য) হয়েছেন, তা অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও সর্বোত্তম বিষয়।" (আল মুগনী-১/১৬৭)

চার মাযহাবের ইমামগণের নিকটও তারাবীহর নামায বিশ রাক'আত :

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.) লিখেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানফী মাযহাবের সকল ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ, ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর এক মতে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) প্রমুখের মতে বিতিরের নামায তিন রাক'আত বাদ দিয়ে তারাবীহর নামায বিশ রাক'আত। দশ সালামে এবং পাঁচ বৈঠকে। (মা'আরিফুস সুনান ৫/৫৪২)
তিনি আরো বলেন, "চার ইমামের মধ্যেও কেউ তারাবীহর নামায বিশ রাক'আতের কমের কথা বলেননি। এবং তারাবীহর নামায বিশ রাক'আত এটি জমহুরে সাহাবীরও মাযহাব। (মা'আরিফুস সুনান ৫/৫৪৩)
তিনি আরো বলেন, "মোটকথা, তারাবীহর নামায বিশ রাক'আত হওয়ার ওপর সমস্ত উম্মত ও ইমামগণ একমত। তাতে কোনো প্রকারের দ্বিমত নেই। (মা'আরিফুসসুনান ৫/৫৪৫)
হাদীসে মারফূ, সাহাবায়ে কেরামের আমল, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা, তাবেয়ীনের আমল, তাবেয়ীনের ইজমা, ইমামগণের আমল, ইমামগণের ইজমাসহ দেড়হাজার বছরের ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, রমাজান মাসে মুসলমানগণ সব সময় তারাবীহর নামায ২০ রাক'আত এবং এর সাথে তিন রাক'আত বিতির আদায় করেছেন। এই আমল ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে সারা দুনিয়ায়। সুতরাং এখন যদি কেউ এটা নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দেয়, বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালায় তবে নিশ্চয় ধরে নেয়া যাবে এতে কোনো প্রকার ভালো উদ্দেশ্য নেই।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

দরসে ফিক্বহ

দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র উপায় "যাকাত"

মুফতী শাহেদ রহমানী

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর ঈমান আনয়ন করার পর বিভিন্ন ধরনের ইবাদতকে ধার্য করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে কিছু ইবাদত এমন, যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের শরীরের সাথে। যেমন নামায, রোজা। এসব ইবাদতকে বদনী ইবাদত বলা হয়। আবার কিছু ইবাদত এমন রয়েছে, যেগুলোর সম্পর্ক শুধু বান্দার হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদের সাথে, যেমন যাকাত। এ ধরনের ইবাদতকে মালি ইবাদত বলা হয়। কোনো কোনো ইবাদত এমনও রয়েছে। যেগুলো শরীর এবং মাল উভয়ের সমষ্টিতে হয়ে থাকে। যেমন : হজ্ব । আলোচিত তিন ধরনের ইবাদতসমূহের মধ্যে নামাযের পর কুরআন হাদীসের আলোকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো উপার্জিত মালের যাকাত প্রদান।

যাকাতের শাব্দিক ও শরয়ী ব্যাখ্যা :

যাকাতের শাব্দিক অর্থ একাধিক পাওয়া যায়। তার মধ্য হতে বহুল ব্যবহৃত ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো। পবিত্রতা, বৃদ্ধি বা ক্রমবৃদ্ধি। যেহেতু যাকাতের মাধ্যমে অবশিষ্ট মালগুলো পবিত্রতা, উন্নতি ও বৃদ্ধি লাভ করে সেজন্য যাকাতকে যাকাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া যাকাতের আরো অনেক অর্থ রয়েছে,

البركة، المدح، الثناء الجميل

অর্থাৎ : প্রশংসা করা, বরকত, উত্তমগুণ ইত্যাদি।

(আদ্দুররুল মুখতার আলা সাদরি রাদ্দিল মুহতার ২/২৫৬, ফতহুল ক্বদীর ২/১৬৩, হেদায়া ১/১৭০, ফিকহুয যাকাত ১/৩৭, আল-বাহরুর রায়েক্ব ২/২০১)

যাকাতের শরয়ী ব্যাখ্যা :

الزكاة هو تمليك جزء مال عينه الشارع من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দ্যেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ যাকাত প্রদানকারীর স্বার্থ /ফায়েদাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে হাশেমী বা তাদের আজাদকৃত গোলাম ব্যতীত অন্য কোনো মুসলমান দরিদ্র ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

(তানবীরুল আবসার আলা সাদরি রাদ্দিল মুহতার ২/২৫৬, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৭০, মাজমাউল আনহার ১/২৮৪, আলবাহরুর রায়েক্ব ২/২০১)

যাকাতের প্রকার :

যাকাত মূলত দুই প্রকার–

১.মালের যাকাত আদায় করা ফরজ।

২.জানের যাকাত, যা আদায় করা ওয়াজিব আর তা হলো ছদকায়ে ফিতর।

মালের যাকাতের প্রকার :

মালের যাকাত কয়েক ভাগে বিভক্ত

১.স্বর্ণ, রুপা এবং টাকা-পয়সার যাকাত।

২. ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

৩. গবাদী পশুর যাকাত

৪. খনিজ সম্পদের যাকাত

৫. ক্ষেতের উৎপাদিত ফসলের যাকাত

তা আবার দুই ভাগে বিভক্ত :

ক. "ওশর" অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানকারী মুসলমানদের মালিকানাধীন জমিনের উৎপাদিত ফসলের যাকাত।

খ. "খেরাজ" অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিমদের মালিকানাধীন জমিনে উৎপাদিত ফসলের মাসুল।

বিঃ দ্রঃ আজকের দরসে ফিক্বহে যাকাতের প্রথম প্রকার অর্থাৎ মালের যাকাতের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

যাকাত কখন ফরয হয় :

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যাকাত হিজরতের পূর্বে মক্কায় ফরজ হয়। (ফতহুল কাদীর ২/২১১, দরসে তিরমিযী ২/৩৯৫, মা'আরিফুস সুনান ৫/১৫৯)

তবে নেসাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মদীনাতে প্রদান করা হয়।

শরীয়তে যাকাতের অবস্থান :

যাকাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। যে কয়েকটি মৌলিক বিধানের ওপর ইসলামের ভিত্তি, যাকাত তার মধ্যে অন্যতম একটি বিধান। নামাযের পরেই তার স্থান। কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং হাদীছে যাকাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি যাকাতের বিধানকে অস্বীকার করে তবে সে কাফের এবং মুরতাদ বলে গণ্য হবে। (সূরা আম্বিয়া আয়াত ৭৩, সূরা বাক্বারা আয়াত ৪৩, সূরা লুকমান আয়াত ৪, বুখারী শরীফ ১/১৮৭, আল হিন্দিয়া ১/১৭০, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৭৩৫)

ট্যাক্স :

যাকাত ইসলামের মৌলিক একটি মহান ইবাদত। একে ট্যাক্স মনে করা সম্পূর্ণ মুর্খতা ও অজ্ঞতার শামিল। এ দুটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। (আ'পকে মাসায়েল আওর উনকা হল ২/২৫৪, মাসায়েলে যাকাত ৪৪)

হেকমত ও উদ্দেশ্য :

যাকাত ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু

হেকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে। মৌলিক কয়েকটি হেকমত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১.ধনী গরিবের মাঝে বিদ্যমান তফাত দূরীকরণ।

২.অন্তর থেকে কার্পণ্যের অপবিত্রতা এবং মহাব্যাধিকে দূর করা।

৩.দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি দরদের বহিঃপ্রকাশ করা।

৪.দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে এবং অন্যের বদনজর থেকে সম্পদকে হেফাজত করা। যেমন রসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

قال رسول الله ﷺ حصنوا اموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء (الطبرانى ، ابو داؤد)

অর্থাৎ : তোমরা তোমাদের মাল-সম্পদকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে রক্ষনাবেক্ষণ করো এবং দান-সদকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো। আর বালা-মুসিবতের জন্য দু'আকে প্রস্তুত রাখো।

৫. ধন-সম্পদের মতো একটি নিআমতের শুকরিয়া স্বরূপ যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৩, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৭৩২, আহকামে ইসলাম আকল কী নযর মে' ১৩৫, মাসায়েলে যাকাত ৩০)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ :

শরীয়তে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত আর কিছু মালের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. যাকাত আদায়কারী মুসলমান হওয়া। সুতরাং কোনো অমুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২. বালেগ হওয়া, অতএব নাবালেগ (বাচ্চা)-এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। চাই সে যতই মালের অধিকারী হোক। এরূপ তার অভিভাবকের ওপর ও তার সম্পদের যাকাত আদায় করা জরুরি নয়।

৩. আকেল (বুদ্ধিমান জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে) অতএব পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

৪. আযাদ (স্বাধীন) হওয়া । অতএব গোলাম/দাস দাসীর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

৫. অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী হলে যাকাত ফরয হওয়ার বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া। (তানভীরুল আবসার আলা হামেশ রাদ্দুল মুহতার ২/২৫৮, আলফাতাওয়া আল আলমগীরিয়্যা ১/১৭১, মাজমাউল আনহার ১/২০২, আল-বাহরুর রায়েক ২/২০২, হেদায়া ১/১৮৫)

যাকাত ফরয হওয়ার কারণসমূহ :

১.নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া।

২.ওই মাল বা সম্পদের ওপর চাঁদের হিসাবে পূর্ণ এক বছর অতিক্রম হওয়া ।

৩. উক্ত মালগুলো এমন ঋণমুক্ত হওয়া যার দাবি বান্দার পক্ষ থেকে করা যেতে পারে।

৪. মালগুলো হাজতে আসলিয়া অর্থাৎ মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়া ।

৫. মালগুলো নামী অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল হওয়া। (তানভীরুল আবসার আলা হামেশ রাদ্দুল মুহতার ২/২৫৯, আলবাহরুর রায়েক ২/২০২, নূরুল ঈজাহ ১৫৬)

মালের সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. মালিকানাধীন থাকাবস্থায় নেসাব পরিমাণ মালের ওপর চাঁদের হিসাবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

২."ছমনিয়্যাতুল মাল" অর্থাৎ স্বর্ণ, রুপা বা টাকা-পয়সা হওয়া।

৩. এগুলো ছাড়া অন্য কোনো মাল হলে তার মধ্যে ব্যবসার নিয়্যাত করা। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৭)

নেসাব বলতে কী বোঝায়?

নেসাব বলতে বোঝানো হয়, কোনো ব্যক্তি ৭.৫ তোলা স্বর্ণ কিংবা ৫২.৫ তোলা রুপা অথবা তার সমমূল্যের নগদ টাকা বা অন্য কোনো মালের মালিক হওয়া। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৯৫, এমদাদুল ফতাওয়া ২/৮, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৭/১৫২, ফতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৪/৩৩)

যাকাতের রোকন :

নেসাব পরিমাণ মাল থেকে নির্দিষ্ট একটি অংশকে পৃথক করে ফকির বা তার নায়েবকে সোপর্দ করে পরিপূর্ণভাবে তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৯)

যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত :

যাকাত আদায় সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মূল সম্পদ থেকে যাকাতের পরিমাণ পৃথক করার সময় বা যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদানকালে নিয়্যাত করা। (আলবাহরুর রায়েক্ব ২/২১০, বাদায়েউস সানায়ে ২/৪০, আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৮)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় :

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বিলম্ব করা ছাড়া যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। বিনা ওজরে যাকাত প্রদানে বিলম্ব করলে গোনাহগার হবে। (আদ্দুর রুল মুখতার ২/২৭১-২৭২)

যাকাত আদায় করার সময় :

১.স্বর্ণ, রুপা, টাকা-পয়সা বা ব্যবসায়িক পণ্য হলে প্রতিবছর অন্তর একবার যাকাত আদায় করা ফরয।

২. ক্ষেতে উৎপাদিত শস্য বা ফল হলে যা উৎপাদিত হবে এবং বছরে যতবার উৎপাদিত হবে ততবার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৩২৬)

যাকাত আদায় না করার পরিণতি :

যাকাত আদায় না করলে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি সম্পর্কে নিম্নে কিছু আয়াত ও হাদীস তুলে ধরা হলো। কুরআনে পাকের একটি আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب

اليم ، يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون۔

"যারা স্বর্ণ ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। এবং তার দ্বারা তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। সেদিন বলা হবে, এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং যা জমা করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো।"
(সূরায়ে তাওবা, আয়াত নং-৩৪, ৩৫)

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন আর সে তার যাকাত প্রদান করেনি কেয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো সাপস্বরূপ বানানো হবে। যার চক্ষুর ওপর দুটি কালো বিন্দু থাকবে। কেয়ামতের দিন তাকে তার গলায় বেড়িস্বরূপ করা হবে। অতঃপর সাপ তার মুখের দুদিকে কামড়ে ধরবে। তারপর বলবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত ধন। (বোখারী শরীফ ১৮৮পৃষ্ঠা প্রথম খণ্ড, মেশকাত শরীফ-১৫৫ নং পৃষ্ঠা প্রথম খণ্ড)

২. হযরত আবু যর (রা.) রসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে কোনো ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল, ভেড়া থাকবে অথচ সে এগুলোর হক্ব (যাকাত) আদায় করবে না সেগুলো কেয়ামতের দিন পূর্বে যেরূপ ছিল, তার চেয়ে বড় মোটা তাজা করে আনা হবে। তারা তাকে তাদের ক্ষুর দ্বারা পিষতে থাকবে। এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে যখনই তাদের শেষ দলটি অতিক্রম করবে, প্রথম দলটি পূনরায় আনা হবে। এভাবেই চলতে থাকবে। যে পর্যন্ত মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা সমাধান না হয়ে যায়। (বুখারী শরীফ, ১৮৮পৃষ্ঠা প্রথম খণ্ড মেশকাত শরীফ-১৫৬ পৃষ্ঠা তৃতীয় খণ্ড)

৩. হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল (সা.)কে বলতে শুনেছি, যে সমস্ত মালের সাথে যাকাতের মিশ্রণ হবে তবে নিশ্চয়ই তা তাকে ধ্বংস করে দেবে। (মেশকাত শরীফ- পৃ: ১৫৭,)

৪. দুজন মহিলা হুজুর (সা.)-এর নিকট এলেন, তাদের হাতে স্বর্ণের চুড়ি ছিল। রসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এগুলোর যাকাত দিয়েছো? উত্তরে বললেন–না! যাকাত দিইনি। হুজুর (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমরা কি এটি পছন্দ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আগুনের দুটি চুড়ি পরাবেন? বললেন–না! হুজুর (সা.) বললেন, তাহলে এগুলোর যাকাত আদায় করো। (তিরমিজি শরীফ-১৩৮ পৃ, ১ম খণ্ড)

যাকাতের পরিমাণ :

১.মূলধন শুধুমাত্র স্বর্ণ, রুপা বা টাকা-পয়সা হলে ৪০ ভাগের এক ভাগ । (বাদায়েউস সানায়ে ২/১৮)

২. ব্যবসায়িক পণ্য হলে ৪০ ভাগের ১ ভাগ। (বাদায়েউস সানায়ে ২/২১)

৩. উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং দুম্বার যাকাতের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে হচেছ, তাই সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো না।

৪. ক্ষেতে উৎপাদিত শস্য এবং ফলমূলের যাকাতের পরিমাণ নিম্নরূপ :

ক. যে সমস্ত জমিনের পানির ব্যবস্থা বৃষ্টি, বর্ষা বা কুদরতিভাবে হয় ওই সমস্ত ক্ষেতের উৎপাদিত ফসলের ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত হিসেবে প্রদান করা ওয়াজিব।

খ. আর যদি এমন হয় যে, পানির ব্যবস্থা সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেরই করতে হয় তাহলে উৎপাদিত ফসলের ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৬২)

যাকাত কারা গ্রহণ করতে পারবে :

শরীয়তের দৃষ্টিতে সবাই যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারবে।

১.ফক্বীর, (অভাবী ব্যক্তি) যার কাছে সামান্য পরিমাণ মাল আছে। যা নেসাব সমপরিমাণ নয়। অথবা নেসাব পরিমাণ হলেও তা ঋণমুক্ত এবং বৃদ্ধিশীল এবং তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়।

২. মিসকিন অর্থাৎ নিঃস্ব ব্যক্তি যার কিছুই নাই ।

৩. আমেল অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুপাতে তার কাজের পরিমাণ মতো যাকাতের মাল থেকে প্রদান করা জায়েয হবে।

৪. এমন ঋণী ব্যক্তি যার নিকট ঋণের অতিরিক্ত নেসাব বা তার সমপরিমাণ মাল নাই।

৫. আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে যাকাত দান করা, যে মুজাহিদ বাহিনী অথবা হাজী কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে (পথ হারিয়ে ফেলেছে)।

৬. মুসাফির ব্যক্তি যার মাল সম্পদ আছে বটে কিন্তু তার সাথে নেই।

৭. মুকাতাব অর্থাৎ যেই গোলাম স্বীয় মাওলার সাথে নির্ধারিত বিনিময়ের ওপর আযাদ হওয়ার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যাকাত আদায়কারী উপরোল্লিখিত সব শ্রেণীর লোককে যাকাত প্রদান করতে পারবে। এবং চাইলে একাধিক শ্রেণীর লোক থাকা সত্ত্বেও কেবল এক শ্রেণীর লোককে যাকাত দিতে পারবে।
(তানভীরুল আবসার ২/৩৩৯, আলবাহরুর রায়েক্ব ২/২৪০, নূরুল ঈজাহ ১৬০)

মালফূযাতে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

(হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে এবং বিভিন্ন মাহফিলে দেওয়া সমসাময়িক বিভিন্ন মাওয়ায়েয ও বয়ান থেকে সংগৃহীত)

☆ দেশের পরিস্থিতি এক সময় এমন ছিল যে, হঠাৎ দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। আপামর জনসাধারণ দ্রব্যমূল্য নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। বাজারের এমন অস্থিতিশীল অবস্থা, সকালে এক দাম বিকেলে আরেক মূল্য। এমতাবস্থায় হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) কক্সবাজারের সফরে ছিলেন। বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষকগণ হযরতকে এসে বলতে লাগলেন, হুজুর! দ্রব্যমূল্যে এহেন জটিল অবস্থা। হযরত মাদরাসার সভায় বয়ানকালে বললেন, আমরা মাদরাসা ওয়ালারা পবিত্র কুরআনে পাকের বরকতেই পানাহার করি। দেশের দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তাতে মাদরাসাওয়ালাদের কী? মাদরাসা ওয়ালারা তো এমন নয় আজ এত টাকা রোজগার করে এনেছে সেটা খেতে হবে। মাদরাসা ওয়ালারা তো পবিত্র কুরআনের খাদেম। যে যত বেশি ইখলাসের সাথে কুরআন মজীদের খেদমাত আঞ্জাম দিবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বরকতে তার সেরূপ উন্নত মেহমানদারী করবেন। সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আমাদের কী? আমি তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আল্লাহ পাক কোনো দিন কুরআনের একনিষ্ঠ খাদেমদের রিযিক সংকীর্ণ করবেন না। তবে কুরআনের খেদমত কুরআনের শান মতে হতে হবে। ইখলাস ও নিষ্ঠা থাকতে হবে। দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা সম্পূর্ণরূপে অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে। ইনশাআল্লাহ কুরআনে পাকের বরকত আসতে থাকবে।

☆ আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের এক বৈঠকে হযরত বলেন, ভায়েরা, মানুষ যত হবে মতও তত হবে। মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য হবে, আলেমদের মধ্যে মতভেদ হবে। দুনিয়াতে কোনো সময় এমন ছিল না যখন কোনো প্রকার মতভেদ মানুষের মধ্যে ছিল না। সেরূপ উলামায়ে কেরামের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। সুতরাং মতপার্থক্য হওয়া কোনো দোষনীয় বিষয় নয়। বরং ভয়ঙ্কর বিষয় হলো মতপার্থক্য ক্রমান্বয়ে বৈরীতার রূপ নেওয়া। ওলামায়ে কেরামের মতভেদ হবে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। কারো কাছে কোনো বিষয় হক্ব মনে হয়েছে সেটা আল্লাহর ওয়াস্তে হবে। আরেক আলেমের কাছে আরেকটি বিষয় হক্ব মনে হয়েছে সেটাও ইখলাসের কারণে। উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য এই পরিধির ভিতরেই থাকতে হবে। যদি এই মতপার্থক্য বৈরীতার রূপ নেয়, দুশমনী সৃষ্টি করে তাহলে এটা পুরো উম্মতের জন্যই ক্ষতি কর হবে।

☆ আলজামিয়া পটিয়ায় দীর্ঘদিন খেদমাত আঞ্জাম দেয়ার পর হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) একদা পটিয়া থেকে পৃথক হয়ে যান। এর কিছু দিন পর পটিয়া মাদরাসার তৎকালীন মহাপরিচালক হযরত মাওলানা আলহাজ ইউনুস সাহেব (হাজী সাহেব হুজুর (রহ.)) এক দিন জামিয়া পটিয়ার জামে মসজিদে ঘোষণা দেন যে, মুফতী সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর জন্য আপনারা দু'আ করুন। তখন অবশ্য অধম (লেখক) পটিয়া মাদরাসারই ছাত্র। হযরত হাজী সাহেব হুজুরের কথা শুনে কিছু ছাত্র হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) কে দেখতে যাওয়ার মনস্থ করেন। পরের দিন একটি গাড়ি ভাড়া করে হুজুরের বাড়ি যাওয়া হয়। হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) ছাত্রদেরকে ডাল-ভাত দিয়ে আপ্যায়ন করেন এবং জুহরের পর মসজিদে ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু নসীহতমূলক কথা বলতে গিয়ে বলেন, আপনাদের পুরো জীবনের জন্য আমার নসীহত হলো কারো গীবত করবেন না, কারো সাথে হাসাদ বা ঈর্ষা রাখবেন না। فلا تخف لومة لائم

☆ একদা পরীক্ষার মৌসুমে ছাত্রদের উদ্দেশে হযরত বলেন, ভায়েরা! আজ বৃহস্পতিবার। শনিবার থেকে তোমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দু'আ করো। যাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারো। দু'আর উপকার তোমরা পাবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো স্বপ্নেও তোমরা প্রশ্ন সম্পর্কে অবগত হয়ে যেতে পারো। অথবা তোমাদের প্রশ্ন সহজ হবে। কিন্তু ভায়েরা কোনো সময় নকল করবে না। নকল করার মধ্যে একে তো চুরির গোনাহ। দ্বিতীয়ত খিয়ানতের গোনাহ হবে। তোমরা ইলমে দ্বীন শিখতে এসেছ সুতরাং চুরি বা খেয়ানত তোমাদের কাছ থেকে শোভা পায় না। আমাদের মুরশিদ হযরত হারদূয়ী (রহ.) বলতেন, নকল করে পরীক্ষায় পাস করা দোযখের পথ সুগম করে। নকল করা ছাড়া আল্লাহ না করুন যদি ফেলও হয়ে

যাও তবে জান্নাতের পথ সুগম করবে। এখন তোমরা বলো তোমরা কি জাহান্নামের পথ সুগম করবে না কি জান্নাতের পথ সুগম করবে।

☆ হযরত বলেন, জনৈক লোকের পিতা ইন্তিকাল করলে তিনি নিজ চাচার হাতে পালিত হন। অভাব-অনটনে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছে তাকে। এখন বড় হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে এত সম্পদ দান করেছেন যে, তিনি একজন শিল্পপতি হয়ে গেছেন। কোনো কিছুর অভাব এখন আর বাকি নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরাত খানাপিনা কম করতে করতে তাঁর উদর সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। এখন তাঁর উদরে খানা যায় না। আসলে এটিই নিয়ম। খানা অতিরিক্ত ভক্ষণ করলে ক্রমান্বয়ে পেট বড় হয়ে যায়। কিন্তু কম ভক্ষণ করার কারণে ক্রমান্বয়ে উদর শুকিয়ে যায়।

আমাদের তালেবে ইলমীর জামানায় দারুল উলূম দেওবন্দে জনৈক ছাত্র দরখাস্ত করল যে, দুটি রুটি দিয়ে আমার যথেষ্ট হয় না। কমপক্ষে আটটি রুটি প্রয়োজন। হযরত মুহতামিম সাহেব নাযেমে মতবখকে লিখে পাঠালেন যে, এই ছাত্র যদি তিন দিন পর্যন্ত নিয়মিত আটটি করে রুটি খেতে পারে তবে তাকে প্রতিদিন আটটি করেই রুটি দেওয়া হোক।

আমি বলছিলাম, বেশি খাওয়ার কারণে পেট বড় হয়ে যায়। বেশি বেশি হাঁটার কারণে পায়ের রগগুলো সচল হয়। যদি কোনো লোক চার মাস যাবত পা'কে অকার্যকর রাখে চার মাস পর দেখা যাবে সে পা আর কাজ করছে না। সেরূপ বেশি পড়ার মাধ্যমে মেধা প্রখর হয়।

খেতে খেতে পেট বড় হয়, হাঁটতে হাঁটতে পায়ের রগ সচল হয়, পড়তে পড়তে মস্তিষ্ক তেজী হয়, বলতে বলতে বয়ানী হয়ে যায় সেরূপ আল্লাহর যিকির করতে করতে আহলুল্লাহ হয়ে যায়। কোনো লোক যদি ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির নিয়তে কোনো আল্লাহ ওয়ালার কাছে চার মাস কালাতিপাত করে আত্মশুদ্ধির চর্চা করতে থাকে সে নিজেই আহলুল্লাহ হয়ে যায়। বেশি পড়ার কারণে দেমাগ খুলে। সে কারণে আকাবের গণ ইলমে মান্তিক বা যুক্তিবিদ্যাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আজ অবশ্য ইলমে মান্তিককে দরসে নেযামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হচ্ছে বা চেষ্টা চলছে।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, যদি মুসলমানগণ গোনাহমুক্ত হয় (তাওবার মাধ্যমে হোক) দুনিয়ায় তাদের কোনো প্রকার পেরেশানি নেই। তার কাছে সম্পদ থাকুক আর না-ই থাকুক। সর্বাবস্থায় সে খুশি ও আরামের মধ্যেই দিনাতিপাত করবে। কিন্তু জীবন যদি গোনাহমুক্ত না হয় তবে যত সম্পদের মালিকই হোক না কেন পেরেশান ও চিন্তা ফিকির লেগেই থাকবে। আপনারা দেখছেন দুনিয়ায় অমুসলিমদের কাছে অঢেল সম্পদ বিদ্যমান, মনোরম গাড়ি, চোখধাঁধানো অট্টালিকা তাদের কাছে আছে। কিন্তু এত আরাম-আয়েশের বস্তু থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মনঃস্থিতি ও আন্তরিক আরাম বলতে কিছুই নেই। সব সময় তারা পেরেশান। সেরূপ মুসলমানও যারা গোনাহ থেকে মুক্ত নয় তিনি যত বড় শিল্পপতিই হোক না কেন, শাসক, আমীর, গরিব হোকনা কেন, বড় বড় বাড়ি-গাড়ির মালিকই হোক না কেন, কারো কাছে আরাম এবং স্থিতি নেই। কিন্তু যদি গোনাহ থেকে মুক্ত হয় তবে সে আরামেই আছে। শান্তিতেই আছে। কোনো প্রকার পেরেশানি তার মাঝে নেই। এমতাবস্থায় সম্পদ না থাকলেও কোনো পেরেশানি নেই। একটা কাপড় উপরে আরেকটা নিচে বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। না কোনো চোরের ভয় আছে না কোনো কিছু রক্ষার পেরেশানি আছে। বরং শুয়েছে আর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। খুব শান্তিতে রাত কাটল। সেহরীতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠল, নিজের পালনকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করল।

বন্ধুগণ! আমরা সব সময় গোনাহ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করব। তখন আমাদের না খানার চিন্তা থাকবে, না ঘর-বাড়ির পেরেশানি থাকবে।

কাজ-কারবার নেই তাহলে কোত্থেকে খাব, কাল ওখানে যেতে হবে, গাড়ি নেই তবে কিভাবে যাব? সন্তান-সন্ততির জন্য কিছু গচ্ছিত রাখতে না পারলে তাদের কী অবস্থা হবে? এসব ফিকির বিধর্মীদের ফিকির। বনী ইসরাইলের স্বভাব। তাদের সেখানে প্রতিদিন তাজা তাজা 'মান্নাসালওয়া' আসমান থেকে আসতে থাকত। তার পরও আল্লাহর সত্তার ওপর তারা আস্থা রাখতে পারেনি। তারা চিন্তা করল, যদি কাল খানা না আসে তবে আমাদের অবস্থা কী হবে? আমরা খাব কোত্থেকে? এ কারণে তারা চুপিসারে কিছু সঞ্চয় করে রাখল। আল্লাহর নিয়ামত এবং পুরস্কারের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল না। অন্তরে যে সকল পেরেশানি ও ফিকির জন্ম হচেছ সবই তো শয়তানের ওয়াসওয়াসা। সে কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন "শয়তান তোমাদের স্পষ্ট দুশমন।" আমরা যেমন পার্থিব দুশমন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে থাকি, যারা আমাদের রূহানী দুশমন আমাদেরকে জাহান্নামে নেয়ার সব সময় চেষ্টায় লিপ্ত, সব সময় আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে তাদের কাছ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। নিজের জীবনকে গোনাহমুক্ত করতে হবে। যদি কোনো সময় গোনাহ হয়েও যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে গোনাহমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

গ্রন্থনায় :
হাফেজ মাওলানা এমরান
ফাজেলে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং
শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা-৪

মাওলানা মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মধ্যস্বত্ব সব ক্ষেত্রেই কি উঠে যায়?

অনেক ক্ষেত্রেই নয়, যেমন কোনো কোম্পানি যদি MLM কোম্পানির মাধ্যম ছাড়া ও তার পণ্য বাজারজাত করে, তবে স্বাভাবিক কারণেই সে বিজ্ঞাপন প্রচার করবে, তাহলে বিজ্ঞাপন খরচ তো হচ্ছেই আর যদি শুধু MLM-এর মাধ্যমেই তাদের পণ্য বাজারে আসে তাহলে এর বাজারমান যাচাই হবে কোন নিরিখে? এ ছাড়া ইতিপূর্বেও আলোচনা এসেছে যে, সবক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী উঠে যায় না।

মুনাফার অংশীদার কে হয়, ভোক্তা না কর্মচারী?

এমএলএম কোম্পানিগুলোর সবচেয়ে বড় শ্রুতিমধুর দাবি হলো তারা মধ্যস্বত্বভোগী উঠিয়ে দিয়ে সে মুনাফা ক্রেতাদেরকে দিয়ে থাকে। আসলে কি তাই? নিশ্চয়ই নয়। কারণ এ কথা বাস্তবসম্মত তখনই হতো, যদি তারা (তাদের ভাষায়) মধ্যস্বত্বকে মুনাফাদানকারীদের থেকে কম মূল্যে সাধারণ লোকদের জন্য বাজারে পণ্য সরবরাহ করত। মূলত তারা মুনাফা বা কমিশন দিয়ে থাকে তাদের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের, যারা ডিস্ট্রিবিউটর পদবি নিয়ে তাদের পণ্য বাজারজাত করে থাকে। একজন সাধারণ ক্রেতা (যে পরিবেশক হচ্ছে না) কখনো তাদের থেকে অতিরিক্ত সুবিধা পায় না।

আরো বহু ত্রুটি :

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও এমএলএম তথা নেটওয়ার্ক পদ্ধতির ব্যবসাটিতে আরো অনেক ত্রুটি রয়েছে, যার কারণে এ ধরনের কারবার বা ব্যবসা বন্ধ হওয়া দরকার। যেমন–

১। অঢেল অর্থ উপার্জনের লোভ :

অনেকে কোম্পানির সেমিনার দেখে বা কোনো বাকপটু ডিস্ট্রিবিউটরের কথায় গলে গিয়ে নিজ ভবিষ্যৎ না বুঝেই প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও পণ্য কিনে পরিবেশক হয়ে থাকে। অথচ দেখা যায় সে কোনো ক্রমেই আর ক্রেতা জোগাড় করতে সক্ষম হয় না। ঠিক যেমনি শিশুরা কোমল পানীয়ের বোতলের ছিপিতে তাদের কাঙ্ক্ষিত উপহার পাবার আশায় বহু বোতল একত্রে নিয়ে থাকে।

২. বিনা প্রয়োজনে পণ্য ক্রয় করা :

অনেকেই শুধু পরিবেশক হওয়ার জন্য শর্ত পূরণের স্বার্থে ওই পণ্য থেকে অধিক প্রয়োজনীয় পণ্যের দরকার থাকা সত্ত্বেও সে কোম্পানির আইনের বাধ্য হয়ে তার জন্য অপ্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনে থাকে।

৩. বিনা প্রয়োজনে অন্যকে গছিয়ে দেওয়া :

কোনো কোনো পরিবেশক তার নেট অগ্রসর করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তখন সে তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে তাদের কোম্পানির সরবরাহকৃত বিভিন্ন পণ্য খরিদ করতে জোর আবদার করে। অনেক সময় নিজ থেকে বাকিও দিয়ে বসে। এভাবে অনেক লোক তুলনামূলক কম প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও শুধু আবদার রক্ষার জন্য পণ্য নিয়ে থাকে।

৪. মূল পেশায় দায়িত্বশীলতা হ্রাস পাওয়া :

MLM কোম্পানিগুলোতে বহু তৎপর ডিস্ট্রিবিউটর এমনও রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন পেশায় যেমন শিক্ষকতা, চাকরি ইত্যাদিতে নিয়োজিত। এখন লোকটি যদি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর দীর্ঘ সময় ক্রেতার খোঁজে সময় ব্যয় করেন এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রাম না করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই পরের দিন মূল পেশাগত কর্মে তার আগের উদ্যম ও কর্ম তৎপরতায় ভাটা পড়তে পারে, যা কোনো সময় জাতীয় বিপর্যয়ও ডেকে আনতে পারে।

৫. ছবি তুলতে হয় :

বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা ইসলামী শরীয়তে অবৈধ ও হারাম। আর এমএলএম ব্যবসাটি প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না।

৬. জাল সার্টিফিকেটের আশ্রয় নিতে হয়:

কোনো কোনো এমএলএম কোম্পানিতে পরিবেশক হওয়ার জন্য নিম্নপক্ষে এসএসসি সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তি এসএসসি পাস করেনি নিশ্চয় তার জাল সার্টিফিকেটের আশ্রয় নিতে হয়। যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

৭. অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যারও আশ্রয় নিতে হয় :

সুতরাং যে সকল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে উপরে বর্ণিত শরয়ী ত্রুটিসমূহ (সাফকাতাইনি ফী সাফকাতিন, আল গারার, রিবা, শুবহাতুর রিবা, জুয়া এবং আল উজরাতু বিলা আমালিন ওয়াল আমালূ বিলা উজরাতিন) বা তার কোনোটি পাওয়া যাবে সেটি ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয বলে গণ্য হবে।

অতএব এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা

কোম্পানি গঠন করা, পরিচালনা করা বা পরিবেশক হওয়া ও মানুষকে এর প্রতি দাওয়াত দেয়া থেকে সকল মুসলমানের বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

ক্রয়কৃত পণ্য ও বোনাসের বিধান :

এ কথা স্পষ্ট যে, এমএলএম কোম্পানিগুলো পরিচালিত ব্যবসাটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অর্থনীতির সাধারণ ধারার পরিপন্থী। সকল মুসলমানের তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এমনিভাবে ব্যবসাটি যেহেতু অবৈধ ও হারাম তাই যারা এতে জড়িয়ে গেছেন তাদের তাওবা করা আবশ্যক। সাথে সাথে আকদটি ভেঙে দেওয়াও জরুরি। আকদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে পণ্যটি বিক্রেতা ফেরত পাবে। আর ক্রেতা ফেরত পাবে তার ক্রয় মূল্য। কোনো কারণ বশত আকদ ভেঙে দেওয়া সম্ভব না হলে (যেমন কোম্পানি যদি ক্রয়মূল্য ফেরত দিতে প্রস্তুত না থাকে) যেহেতু অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত পণ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয নেই, সেহেতু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া এমনিতেই পণ্যটির দ্বারা লভ্যাংশ ফকীর মিসকীনদেরকে দিয়ে দিতে হবে।

আর বোনাস হিসেবে যে অর্থ লাভ হয়েছে সেগুলোও যেহেতু অবৈধ ও বাতিল আকদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, এ জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মালে খবীস তথা অপবিত্র সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। যা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া এমনিতেই হারাম থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ফকীর মিসকিনদের মাঝে সদকাহ করে দেওয়া জরুরি।

جاء فى الدر المختار ٥/٧٠: احكام البيع الفاسد واذاملكه يثبت كل احكام الملك الا خمسة لايحل اكله ولا لبسه ولا وطؤها الخ

"ফাসিদ আকদের মাধ্যমে হস্তগত পণ্যে সকল হুকুম বর্তাবে তবে পাঁচটি হুকুম ১.তা খাওয়া হালাল নয়। ২. তা পরিধান করা হালাল নয়।

وفى الهنديه ٣/١٤٧: ويكره للمشترى ان يتصرف فى مااشترى شراء فاسدا بتمليك او انتفاع الخ۔

"আকদে ফাসেদের মাধ্যমে হস্তগত পণ্য হস্তান্তর করা বা উপকৃত হওয়ার জন্য কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা মাকরূহে তাহরীমী।"

وفى معارف السنن ١/٣٤ : قال شيخنا الكشميرى ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها انه ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد الى المالك فسبيله التصدق على الفقراء۔

"আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেছেন, হানাফীদের কিতাব হিদায়া ও অন্যান্য কিতাবাদী অধ্যয়ন করলে এ কথা স্পষ্টই বুঝে আসে যে, অবৈধ পন্থায় সম্পদ কারো হস্তগত হলে তা যদি মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে এ সম্পদ ফকীর মিসকীনদের মাঝে সওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া বণ্টন করে দেয়াই হারাম সম্পদ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

ডেসটিনির শরয়ী বোর্ডের দলিল ও তার জবাব :

যারা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা নেটওয়ার্ক বিজনেস সিস্টেমকে জায়েয বলে তারা দুটি শর্ত আরোপ করে।

১. এ পদ্ধতিতে লাভের জন্য কোনো ধরনের প্রতারণা, জুলুম, খেয়ানত, সুদ এক চুক্তির মধ্যে দুটি চুক্তি করা ও অস্বাভাবিক লাভ এর কোনো একটি সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

২. শরীয়তের নিষিদ্ধ পণ্য বিপণন করা যাবে না।

ক. আল কুরআনের আলোকে :

পণ্য ক্রয় করার সময় নতুন গ্রাহক পরিবেশক আনার শর্ত না থাকলে আমরা এ পদ্ধতিকে কমিশন বা দালালি তথা ব্রোকারি বলতে পারি। ত ছাড়াও এ পদ্ধতিকে ফিকহের ভাষায় আল জাআলা (الجعالة) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইউসূফ (আ.) ও বেনিয়ামীন এর মধ্যে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে যে আয়াত উল্লেখ করেছেন সে আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ্য। ইরশাদ হচ্ছে :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم۔

"ঘোষণা কারীগণ বলেন, বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছে, যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।" সূরা ইউসুফ আয়াত ৭২)

এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী শফী (রহ.) তাফসীরে কুরতুবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরি কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে সে এই পরিমাণ পুরষ্কার কিংবা মজুরি পাবে। তবে তা জায়েয হবে। যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরষ্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ-জাতীয় লেনদেন ফিকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়। তথাপি এ আয়াত দৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয় (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন সংক্ষিপ্ত পৃ. ৬৮২)

খ. সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ :

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত , তিনি বলেছেন, একদল সাহাবী আরব দেশের এক এলাকায় গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু এলাকাবাসী তাদের কোনো আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল না। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, তাদের গোত্র প্রধানকে সাপে কেটে ছিল। তখন তারা সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের

কেউ ঝাঁড়ফুক করতে পারে? সাহাবীগণ বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনারা আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেননি। তাই আমরা কিছু করতে পারব না। অথবা আমাদের জন্য বিশেষ পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ করলে আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। তখন তারা একপাল ছাগল দানের কথা ঘোষণা করলেন। সে মুহূর্তে জনৈক সাহাবী সূরা ফাতিহা পাঠ করে মুখে থুথু জড়ো করে ফু দেয়া মাত্রই গোত্র প্রধান আরোগ্য লাভ করেন। ফলে তারা সাহাবীগণকে একপাল ছাগল প্রদান করে। সাহাবীগণ বললেন, রসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা ছাড়া আমরা এ ছাগল গ্রহণ করব না। সাহাবীগণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি হেসে বললেন, তোমরা কী করে জানলে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ফু দিলে রোগী ভালো হয়ে যাবে? যা হোক, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তা থেকে আমাকে একাংশ দিও। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইজারা)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহার মাধ্যমে ফু দিয়ে বরাদ্দ করা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করা যেমন বৈধ, তেমনি অন্য যে কোনো কাজের জন্য নির্ধারিত করা অংশ গ্রহণ করাও বৈধ। উক্ত ব্যাখ্যায় যাদুল মা'আদ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, একদল লোক কোনো কাজকে নিজেদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে নেয়, এ জন্য যে, তারা সবাই এ কাজের বিনিময়ে নির্ধারিত অর্থ পাবে। তাহলে সেই অর্থ সবাই বণ্টন করে নিতে পারবে। (রাওযুল মুরবি' গ্রন্থের পাদটীকা ৫/৪৯৭)

গ. যুক্তির আলোকে প্রমাণ :

সমাজে আল জা'আলা বা নির্ধারিত পুরস্কার বা অংশ ঘোষণা করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই প্রয়োজনের চাহিদার প্রতি নজর রেখেই সমাজের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বটে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, কুরআন সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে আল-জা'আলা সম্পূর্ণ বৈধ। আর এমএলএম বা নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে আল জা'আলার আধুনিক রূপ বলতে পারি।

উক্ত দলিলসমূহের জবাব :

তারা যে কুরআনের আয়াত ও হাদীসটি মাল্টি লেভেল মার্কেটিং ব্যবসাটি জায়িয এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন এই আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেখলে সকলেই বুঝতে পারবে যে, এ আয়াত ও হাদীসের সঙ্গে মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে না। কারণ উক্ত আয়াত ও হাদীসের ঘটনার মধ্যে নেই কোনো অবৈধ চুক্তি, নেই সুদ ও জুয়া ইত্যাদি। আর মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের মধ্যে রয়েছে একচুক্তির মধ্যে আরেকটি চুক্তি, সুদ, জুয়া ও প্রতারণা ইত্যাদি। যা আমরা ইতিপূর্বে কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি। যারা মাল্টি লেভেল মার্কেটিংকে জায়েয বলে তারাও এ কথা স্বীকার করে যে, যে এমএলএম পদ্ধতিতে সুদ, প্রতারণা ও অবৈধ চুক্তি রয়েছে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

সুতরাং যেহেতু সকল মাল্টি লেভেল কোম্পানিগুলোতে শরীয়ত নিষিদ্ধ উক্ত কারণসমূহ রয়েছে, তাই তা বৈধ হতে পারে না।

আর আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, কোম্পানিগুলোর কমিশনকে উপহার/পুরস্কারের সাথে তুলনা করাও বলা যাবে না। আর যে জিনিসটিকে কুরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে অনর্থক যুক্তি পেশ করা একটি অজ্ঞতার পরিচয় দেয়া বৈ আর কিছুই নয়।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সম্পর্কে কোনো কোনো আলেমের মতামত ও তার জবাব:

কোনো কোনো আলেম বলেন, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সিস্টেম পরিচালিত কোম্পানিগুলো বৈধ-অবৈধতার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে মূলত ৩টি বিষয় আমাদের সামনে পরিষ্কার হওয়া জরুরি।

১. একাধিক চুক্তির সমাবেশ। ২. পণ্যের গুণগত মান। ৩. বাজার দরের সাথে সঙ্গতি।

১. একাধিক চুক্তির সমাবেশ : তারাও আমাদের সাথে এ কথায় একমত পোষণ করেন যে, এমএলএম পদ্ধতিতে ব্যবসায় নিয়োজিত কোম্পানিগুলোর মধ্যে একই সাথে দু'টি চুক্তির সমাবেশ ঘটেছে। আর একাধিক হাদীসে একই সাথে একাধিক চুক্তির সমাবেশ ঘটাতে নিষেধ করা হয়েছে। (এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে দলিল ও ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেছি)

কিন্তু তারা বলেন, আমাদের হানাফী মাযহাবে এ প্রসঙ্গের হাদীসসমূহ শুধু ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কাস্থলের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো কলহ বিবাদ নিরসন করা বা বিবাদ সৃষ্টির উৎস হতে দূরে থাকা। অতএব যে সকল ক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা নেই, সে সকল ক্ষেত্রসমূহ নিষেধাজ্ঞার বহির্ভূত। আর সামাজিক প্রচলন বা উরফ কলহ বিবাদ দূর করে। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিকভাবে অনেকটাই উরফ বা প্রচলন পর্যায়ে এসে পড়েছে। তা ছাড়া এর মাধ্যমে যে ঝগড়া বিবাদ নেই তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কেননা কোম্পানি স্বেচ্ছায় ডিলারশিপ

কার্ড প্রদান করেছেন, সে ক্ষেত্রে ঝগড়া হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই।

সুতরাং এ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি, এমএলএম কোম্পানিগুলোতে যে শর্ত বা একাধিক চুক্তির সমাবেশ ঘটেছে, তা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদকৃত

(١) نهى رسول الله ﷺ عن بيع وشرط

(٢) نهى عن بيعتين فى بيعة

(٣) نهى عن صفقتين فى صفقة

ইত্যাদি হাদীসসমূহের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় বরং অনুকূল। অতএব হানাফী মাযহাবে আলোচ্য একাধিক শর্ত বা চুক্তির সমাবেশ বৈধতার পূর্ণ দাবি রাখে। প্রমাণ :

وفى العناية على هامش فتح القدير ٦/٧٦،٧٧، وفى الاول من القسم الثانى وهو ماكان متعارفا كبيع النعل مع شرط التسريك كذلك لان الثابت بالعرف قاض على القياس لايقال فساد البيع بشرط ثابت بالحديث والعرف ليس بقاض عليه لانه معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المعقود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفى النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث فلم يبق من الموانع الا القياس على ما لا عرف فيه بجامع كونه شرط العرف قاض عليه ، وكذا فى الشامى۔

সারমর্ম হলো, একাধিক চুক্তির সমাবেশ বা শর্তসাপেক্ষে বেচা-কেনা সমাজে প্রচলিত হয়ে যাওয়ার কারণে যদি বিবাদ মুক্ত হয়ে যায় তাহলে হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত থাকে না। অতএব এমএলএম পদ্ধতিতে ব্যবসায় নিয়োজিত কোম্পানিগুলোর মাঝে সন্নিবেশিত একাধিক চুক্তির ব্যাপক প্রচলন হওয়ার সাথে সাথে বিবাদ মুক্ত হওয়ার কারণে তাও হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।

২. পণ্যের গুণগত মান ৩. বাজার দরের সাথে সঙ্গতি।

২ ও ৩ নং পয়েন্টের সার কথা হলো, ধোঁকা ও শোষণমুক্ত হওয়া। আর তা সম্ভব "পণ্যের পয়েন্ট তথা মূল্য তালিকায় উল্লেখিত পণ্যের বিবরণ অনুযায়ী তার গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে বাজার দরে বিক্রয় করার মাধ্যমে, অন্যথায় বৈধ হবে না। অর্থাৎ পণ্য বিবরণের সাথে সঙ্গতি না রেখে শুধু মডেল ঠিক রেখে নিম্নমানের পণ্য উচ্চমানের পণ্যের দরে বিক্রয় করলে ধোঁকা হবে। আর প্রলোভনে ফেলে বাজারের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে অথবা বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রাখে বটে কিন্তু বিভিন্ন খাত দেখিয়ে কৌশলে অনর্থক অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করলে হবে যুলুম ও শোষণ। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে কোনো ব্যবসায় হালাল বা বৈধতার মৌলিক শর্ত হলো লেনদেনে স্বচ্ছতা, এবং ধোঁকা তথা যুলুম ও শোষণ মুক্ত হওয়া। আর এই ধোঁকা তথা যুলুম বা শোষণ উভয়টাই হারাম।

সুতরাং উল্লেখিত পন্থা বা যে কোনো পন্থায় কোনো ধোঁকা বা যুলুমের আশ্রয়ে যদি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি পরিচালিত হয়, তবে কিছুতেই বৈধতার আশা করা যায় না। অন্যথায় বৈধ হবে।

অতএব তারা বলেন, এমএলএম পদ্ধতিতে উল্লেখিত নিষিদ্ধ কারণসমূহ না পাওয়ার কারণে ব্যবসাটি বৈধ হবে। শুধু বৈধ নয় বরং উত্তম হওয়ার দাবি রাখে।

জবাব : ১. যে সকল শর্ত বা চুক্তি ঝগড়া বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে নিষেধ করা হয়েছে, সে শর্ত ও চুক্তি সমাজে প্রচলিত হওয়ার কারণে যদি ঝগড়া বিবাদ থেকে মুক্ত থাকে তাহলে তা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত থাকে না বিধায় বৈধ হবে।

কিন্তু যে সকল শর্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো তাতে সুদ, সুদের সন্দেহ ও সাদৃশ্য, আল-গারার ও জুয়া ইত্যাদি রয়েছে। সেখানে সে শর্ত বা চুক্তি সমাজে প্রচলিত হলেও বৈধ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। হ্যাঁ, তা যদি

تعامل الناس هو عمل المتوارث হয়ে আসতে থাকে বা তার ওপর ইজমা হয়ে থাকে, তাহলে তা শরয়ী দলিল হিসেবে বৈধ হবে।

কিন্তু এমএলএম পদ্ধতিতে এমন শর্ত বা চুক্তি রয়েছে, যেখানে সুদ, সুদের সন্দেহ ও সাদৃশ্য, আলগারার ও জুয়া ইত্যাদি রয়েছে (যা আমরা শরয়ী বিধানে প্রমাণসহ আলোচনা করেছি) তা উরফ বা প্রচলনের কারণে বৈধ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

অতএব আমাদের আলোচ্য বিষয়টি এমন শর্তের কারণে নিষেধ করা হয় নাই যাতে ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা আছে, যা প্রচলনের কারণে বৈধ হয়ে যায়। আর তাদের এ দাবিটিও সঠিক নয় যে, এমএলএম পদ্ধতির শর্ত ও চুক্তি উরফ বা প্রচলন হয়ে গেছে। কারণ উরফ-এর সংজ্ঞায়ই পড়ে না। তাদের দাবিটি এমন হয়েছে যে, কেউ যদি বলে, সুদ খাওয়া, মদ খাওয়া ও জুয়া খেলা এগুলো সমাজে প্রচলন হওয়ার কারণে বৈধ হয়ে গেছে। নাউজু বিল্লাহ।

وفى تكملة فتح الملهم ١/٦٢٨ تفصيل مسئلة الشرط فى البيع فاعلم ان المراد من الشرط ههنا هو شرط يقترن بعقد البيع يضيف اليه شيئا لم يكن داخلا فيه بنفس العقد فان كان ذلك الشئ محرما فى نفسه تفسد او كان فى وجوده غرر فلا خلاف فى عدم جوازه الخ

২ ও ৩ আলোচ্য বিষয়ে তারা সর্বশেষ যে মতামত পেশ করেছেন তা বর্তমান অবস্থায় সঠিক নয়। কিছুক্ষণের জন্য সঠিক মেনে নিলেও এ কথা বলতে হবে যে, শরীয়ত নিষিদ্ধ অন্যান্য কারণে এ ব্যবসাটি বৈধ নয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জ্ঞান ও ইলম : একটি পর্যালোচনা

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

ইলম বা কুরআন-হাদীসের জ্ঞানই সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে কুরআন-হাদীসের ইলম প্রয়োজন। ইলম ছাড়া প্রতিনিধিত্ব অচল। তাই হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেই মহান আল্লাহ তাঁকে ইলম দান করেছিলেন, যে ইলমের বদৌলতে সমস্ত ফেরেশতা তাঁর সামনে মাথানত করে সিজদা তথা সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হয়েছিল। সেদিনের সে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের একমাত্র পাথেয় ছিল ইলম। ইলমই মানুষকে বড় করে, সম্মানিত করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ফেরেশতা কর্তৃক আদম (আ.) কে সিজদা করার বিষয়টিতে দুটি দিক লক্ষ্যণীয়। এক. সিজদা করা হয়েছে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে। কেননা, মহান আল্লাহ হলেন সকল ইলমের আধার। তিনিই সর্বময় ইলমের অধিকারী। ইলম মহান আল্লাহর এক বিশেষ গুণ। তাই, সিজদার প্রাপক তিনিই। দুই. ফেরেশতাদের সিজদাবনত হওয়ার জন্য একটি দিক প্রয়োজন, কোন দিকে তাকিয়ে তারা সিজদাবনত হবে, সে লক্ষ্যে ফেরেশতারা বেছে নিয়েছেন আদম (আ.) কে। যেমনটি আমরা নামাযে সিজদাবনত হওয়ার জন্য কা'বা শরীফকে দিক হিসেবে বেছে নেই, আল্লাহরই আদেশে। মূলত কা'বা ঘরকে আমরা সিজদা করি না, বরং সিজদা করি মহান আল্লাহকে। এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। তা হলো, কা'বা শরীফ যেমন পৃথিবীর সকল মুসলমানের ইবাদতের কেন্দ্র, ভালোবাসার কেন্দ্র, সম্মানিত। অনুরূপভাবে ওই মানুষও মানুষের ভালোবাসার কেন্দ্রে পরিণত হবে, সকলের কাছেই সম্মানিত হবে, যে মানুষটি ইলমের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– 'আল্লাহর রংয়ে রঙিন হও, আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রং আর কার হতে পারে?' {সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৩৮} এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ প্রদত্ত ইলমও শামিল। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে আলেম হও।

দৈহিক শক্তি ও সাহসের ভিত্তিতে যদি মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারিত হতো, তাহলে সবচেয়ে বড় জানোয়ার হাতি ও সবচেয়ে বড় পাখি উটপাখি সম্মানিত হতো। না, শারীরিক ও দৈহিক শক্তিতে সম্মানিত হওয়া যায় না, বরং ইলমের কারণেই মানুষ সম্মানিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– 'বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?' {সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত-৯} না, তারা কখনো সমান হতে পারে না। কারণ একমাত্র আলেম ব্যক্তিই তার ইলমের আভায় ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন–যার মাধ্যমে তিনি সমাজ তথা গোটা জাতির উন্নতি সাধনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, তা নিজে বুঝে কাজ করতে পারেন ও অন্যদেরকে বোঝাতে পারেন।

ইলম অর্জনের প্রতি ইসলামের গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.)-এর প্রতি ৬১০ ঈসাব্দে পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণীটি নাযিল হয়েছিল, তা ছিল– 'ইকরা' অর্থাৎ পড়ুন। কারণ, পড়া ছাড়া কিছুই জানা যায় না। উক্ত আয়াতেই রয়েছে, 'মানুষকে তিনি (আল্লাহ তা'আলা) শিক্ষা দিয়েছেন, যা তারা জানত না।' তাই অজানাকে জানার জন্যই প্রথম ওহীতে নাযিল করেছেন 'ইকরা', যাতে মানুষ অজানাকে জেনে তার দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে ব্যবধান বুঝে তদানুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে সার্বিক উন্নতি হাসিল করতে পারে এবং যাতে করে আল্লাহর হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে তা'মিল করতে পারে। আর যদি ইলমই অর্জন না করে, তবে তাঁর বিধি-বিধান জানা সম্ভব হবে না। আর তাঁর বিধি-বিধানই যদি জানা না হয়, তাহলে তো মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জ্বীন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– 'আমি জিন-ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।' {সূরা ৫১ যারিয়াত, আয়াত-৫৬} এখানে ইবাদত বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুই আল্লাহর হুকুম ও নবী (সা.)-এর তরীকা মতো হওয়া উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর হুকুম ও নবী (সা.)-এর তরীকা অনুসরণ করার নামই ইবাদত। তাই, ইলমের সাথে ইবাদতের সুগভীর সম্পর্ক। ইলম ব্যতীত ইবাদতের সত্যিকারের মজা পাওয়া যায় না। সত্যিকারের খোদাভীতিও অর্জন হয় না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন– 'বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে প্রকৃত আলেমরাই তাঁকে ভয় করে।' {সূরা ৩৫ ফাতির, আয়াত-২৮} হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– 'কোনো ব্যক্তির ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা আমার (হুজুর সা.)-এর নিকট এক হাজার রাক'আত নামাযের চেয়ে অধিক প্রিয়। হুজুর (সা.) আরো বলেন, সেই অবস্থাতেই যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।'{মুসনাদে বাযযার, হাদীস-৮৫৭৪} হুজুর (সা.) আরো ইরশাদ করেন, 'এক হাজার আবেদের চেয়ে একজন ফকীহ আলেম শয়তানের মোকাবেলায় অধিক শক্তিশালী।' {তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২৬৮১}

হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (সা.)

ইরশাদ করেছেন, হে আবু যর! কোনো এক সকালে আল্লাহর কিতাবের কোনো একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশত রাক'আত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর কোনো এক সকালে ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা, চাই সেই ইলম অনুযায়ী আমল করা হোক বা না হোক, এক হাজার রাক'আত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।' {ইবনে মাযাহ, হাদীস-২১৯}

ইলম অর্জনের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তবে বর্তমানে অনেকে না বুঝে কুরআন-হাদীসের ইলম ও দুনিয়াবী অন্যান্য জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তাকেও ইলমের মর্যাদাভুক্ত মনে করে বসে আছে এবং নির্দ্বিধায় স্কুল-কলেজের দেয়ালে লিখে রেখেছে 'জ্ঞান অর্জন করা ফরজ–আল হাদীস'। মনে রাখবেন, জ্ঞান অর্জন করা আর ইলম অর্জন করা এক কথা নয়। 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ বোধ, বুদ্ধি, বুঝবার শক্তি, চেতনা ইত্যাদি। আর 'ইলম' হলো বোধগম্য নয়–এমন জগতের খবরাখবর জানা। বুদ্ধির যাত্রা যেখানে থমকে দাঁড়ায়, ইলমের যাত্রা সেখান থেকে শুরু হয়। জ্ঞান আবর্তিত হয় সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে, আর ইলম আবর্তিত হয় স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে। তাই তো মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–'পড়ো! তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই স্রষ্টাকে জানতে, সেই স্রষ্টার হুকুম-আহকাম, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি জানতে যে পড়ালেখা তারই নাম 'ইলম'। ইলম অর্জন করার মাধ্যম একমাত্র কুরআন ও হাদীস। কুরআন ও হাদীসের পড়ালেখাকেই একমাত্র ইলম বলে। কুরআন-হাদীসের ইলম ছাড়া অন্য সব কিছুই জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– 'ইলম তিন বিষয়ে সীমাবদ্ধ। এক. পবিত্র কুরআনের অপরিবর্তিত আহকাম। দুই. নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবধারিত সুন্নাহ বা আদর্শ। তিন. কুরআন-হাদীস অনুযায়ী ইলমে ফারায়েজ অর্থাৎ উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন নীতিমালা। এ ছাড়া যা কিছু তা ইলম বহির্ভূত অতিরিক্ত বিষয়।' {আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-২৪৯৯}

আজকাল অনেকেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত 'ইলম' শব্দের অনুবাদ 'জ্ঞান' শব্দ দিয়ে করে থাকেন। ইলম শব্দটি কুরআন-হাদীসের একটি বিশেষ পরিভাষা। ইলম সরাসরি মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত হয়। ইলমের সাথে অনেক সময় বোধশক্তিগত বিষয়ের সম্পর্ক থাকে না। যেমন কবরের আযাব। এই বিষয়টি মানুষের বোধশক্তি বহির্ভূত। অথচ তা ইলমের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা মানুষের বোধশক্তি, চিন্তাশক্তি এমনকি কল্পনাশক্তিরও বাইরে। অথচ জান্নাত-জাহান্নামের সকল বর্ণনাই ইলমের অন্তর্ভুক্ত। ইলম ও জ্ঞানের বিষয়গত পার্থক্যের মাঝে অন্যতম পার্থক্য হলো কুরআন ও হাদীস কেন্দ্রিক জ্ঞানই একমাত্র ইলম। কুরআন ও হাদীস ব্যতীত অন্য সব কিছুই ইলম বহির্ভূত অতিরিক্ত বুদ্ধিগত বিষয়। এমন অনেক বিষয় যা মানুষের চিন্তা ও ধারণার অতীত, সেগুলোও ইলমের অন্তর্ভুক্ত। অথচ তা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয় না। যেমন জ্বীন জাতির অস্তিত্ব বিষয়ে জ্ঞান। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জ্বীন জাতি বলে কোন জাতি নেই। সহজ কথায় বললে বলা যায়, সকল ইলমই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সকল জ্ঞানই ইলমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

'ইলম' ও 'জ্ঞান' এক জিনিস নয়। বরং ইলম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, চালাকি–এগুলো সব ভিন্নভিন্ন জিনিস। জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেক সময় বিধিবদ্ধ পড়ালেখারও প্রয়োজন পড়ে না। উস্তাদেরও প্রয়োজন পড়ে না। বরং প্রকৃতি থেকেও জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, কৌশল খাটিয়ে, কারো চালাকি দেখেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। পৃথিবীর অনেক জ্ঞানী মানুষ এভাবেই জ্ঞান অর্জন করে বিজ্ঞানী হয়েছেন। কিন্তু কুরআন-হাদীসের পড়ালেখা ছাড়া কেউ কখনো আলেম হতে পারে না। আলেম হতে চাইলে ইলম শিখতে হবে। কুরআন-হাদীসের লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোনো কিছুই ইলমের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইলমের জন্য মৌলিকভাবে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। এক. কুরআন ও হাদীসের লেখাপড়াই একমাত্র ইলম। দুই. ইলমের সাথে আল্লাহর ভয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মহান আল্লাহর ঘোষণা– 'অবশ্যই আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে যারা আলেম, একমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে। সে কারণেই তো একজন কাফের যতই কুরআন-হাদীসের বিষয়ে পারদর্শী হোক না কেন, তাকে কখনো আলেম বলা হবে না। আলেম হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো আল্লাহর ভয়। আর আল্লাহর ভয়ের প্রথম কথাই হলো ঈমান। এই প্রেক্ষাপটে একজন আলেমের জন্য তার ইলম অনুযায়ী আমল করাটা জরুরি সাব্যস্ত হয়। বে-আমল আলেমকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তিন. ইলম অর্জনের জন্য উস্তাদ জরুরি। নিজে নিজে একাকী ইলম অর্জন করা যায় না। মহান আল্লাহর ঘোষণা– 'তোমরা যদি না জান, তাহলে ইলমওয়ালাদের কাছ থেকে জেনে নাও।' {সূরা ১৬ নহল, আয়াত-৪৩} বাজার থেকে ডাক্তারি বই কিনে এনে নিজে নিজে পড়লে যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না, তদ্রূপ বাজার থেকে কুরআন-হাদীসের বই কিনে এনে পড়লেও আলেম হওয়া যায় না। আলেম হওয়ার জন্য অবশ্যই উস্তাদদের মাধ্যমে ইলম অর্জন করতে হবে এবং সেই উস্তাদদের ধারাবাহিকতা তথা ছিলছিলা তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যম হয়ে হুজুর সা. পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। সে কথাই ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন– 'ইলমের সনদ এটি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।

(বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোবারক হো মাহে রমাজান

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

চাঁদের বার মাসের মধ্যে নবম মাস মাহে রমাজান। রমাজান শব্দটি আরবী রামাজুন থেকে নির্গত। এর অর্থ ওলামায়ে কেরাম অনেক করেছেন। তন্মধ্যে একটা অর্থ হলো জ্বালিয়ে দেওয়া। সে হিসেবে এ মাসের নাম রমাজান রাখা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহমত দ্বারা বান্দার গোনাহ সমূহকে জ্বালিয়ে দেন এবং মানুষের মধ্যে ভালো কাজের উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করেন। আবার অনেকে বলেন, রমাজান শব্দের অর্থ কষ্ট সহ্য করা ও উত্তপ্ত হওয়া এই মাসে যেহেতু সাবালক মুসলিম নরনারী শরয়ী উযর ব্যতীত স্বাভাবিক রোযা রাখার মাধ্যমে ক্ষুধা, পিপাসা ও মানবীয় চাহিদার কষ্ট সহ্য করে তাই এই মাসকে রমাজান মাস বলা হয়।

রমাজান মাসের রোযা মুসলমানদের ওপর কবে ফরজ করা হয়

হিজরতের দ্বিতীয় বছর শা'বান মাসের দশ তারিখে আল্লাহ তা'আলা রমাজানের রোযা মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ করেন। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এই ঐশী বাণী নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাশরীফ আনেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর যাতে করে তোমরা মুত্তাকী, খোদাভীরু ও সংযমী হতে পারো।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

পবিত্র হাদীসে এসেছে–

"রমাজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা আশুরার রোযা এবং আইয়ামে বীজ তথা চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা রাখতেন।

পবিত্র রমাজানের ফজীলত :

মহান রাব্বুল আলামীন এই পবিত্র মাসকে নিজের মাস হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন হাদীস শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "রমাজান মহান আল্লাহ তা'আলার মাস।" (বুখারী ২/৫৮৪ হা: নং ১৮৯৪)

যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই মাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যদ্দরুন এই মাস বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই মাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সম্পর্ক থাকার অর্থ হলো এই মাসের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ তাজাল্লী এত বেশি নাযিল হয় যেমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন– "রমাজান এমন মাস যার প্রথমাংশে আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়, যার ফলে মানুষের জন্য গোনাহের গভীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ইবাদতের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এই মোবারক মাসের মধ্যাংশে পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং শেষাংশে জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক স্থায়ী আযাব হতে রেহাই হয়।" (মীযানুল ই'তিদাল ২/৯৭ হা: নং ৩৩৪৬)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

"রমাজান মাসের প্রথম রজনীতে শয়তানদেরকে মজবুতভাবে বেঁধে রাখা হয় এবং অবাধ্য জ্বিনদেরও বন্দি করে রাখা হয়। দুযখের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোন দরজা পূরা রমাজান মাসে খোলা হয় না এবং জান্নাতের সমস্ত দরজা খোলে দেওয়া হয়। একটা দরজাও বন্ধ করা হয় না। সাথে সাথে একজন আহ্বানকারী আহবান করতে থাকেন, হে ছওয়াব প্রত্যাশীরা অগ্রসর হও, ছওয়াবের মোক্ষম সময়। হে পাপিষ্টরা পাপ থেকে হাত গুটিয়ে নাও এবং নিজেদেরকে গোনাহ থেকে বিরত রাখো। কেননা এই পবিত্র সময়টা তাওবা করার এবং গোনাহ মুক্ত হওয়ার সময়। এই পবিত্র মাস কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য। আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র মাসের সম্মানার্থে অনেক পাপিষ্টদেরকে ক্ষমা করেদেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। আর তা রমাজানের প্রতি রাত্রে। (বায়হাকী শুআবুল ঈমান ৩/৩০১ হা: নং ৩৫৯৭-৯৮)

রোযা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং কিয়ামত দিবসে মহান রাব্বুল আলামীন কোনো মাধ্যম ছাড়াই এর প্রতিদান স্বয়ং নিজেই রোযাদারদেরকে দান করবেন। যেমনটা হাদীসে কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "রোযা আমারই এবং আমিই এর প্রতিদান দেব।" (সুনানে বায়হাকী ৪/৩০৩ হা: নং ৮৫০০)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকে আম্বরের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়।" (বুখারী ২/৫৮৪-(১৮৯৪))

মোটকথা, রোযাদার যেমন আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায় সেরূপ তার মুখের ঘ্রাণও আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমাজানের জন্যই সজ্জিত করা হয় এবং উন্নত মানের সুগন্ধি দ্বারা ধোঁয়া দেওয়া হয়। রমাজান মাসের প্রথম তারিখ থেকে আল্লাহ তা'আলার আরশে আজীমের নিচ থেকে বিশেষ ধরনের এক বাতাস বয়ে আসে, যার নাম

"মশীরা"। যার দোলনায় জান্নাতের গাছের পাতা এবং দরজার কড়া এমনভাবে দোলে, যা থেকে মনমাতানো এক প্রকারের সুরলহরি সৃষ্টি হয়। যে রকম আওয়াজ শ্রবণকারীরা এর পূর্বে আর কখনও শোনেনি। তখন জান্নাতের হুরেরা আপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে জান্নাতের সুউচ্চ দালানে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়। কেউ কি আল্লাহর দরবারে আমাদের সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হতে চায় এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে আমাদের জোড়া বানিয়ে দেবে। এরপর তারা অর্থাৎ জান্নাতের হুরেরা জান্নাতের দায়িত্বরত ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, এ রাতটা এত অদ্ভুত কেন? ফেরেশতারা লাববাইক বলে উত্তর দেবেন। হে পরম সুন্দরী উত্তম চরিত্রের অধিকারী মহিলারা! এই রাত হলো রমাজান মাসের প্রথম রাত এবং মহান আল্লাহ জান্নাতের প্রধান অফিসার অর্থাৎ রিজওয়ানকে সম্বোধন করে বলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোযাদারদের জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দাও এবং জাহান্নামের প্রধান অফিসার "মালেক"কে সম্বোধন করে বলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোজাদারদের জন্য জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ করে দাও। হযরত জিবরাঈল (আ.) কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, জমিনে গিয়ে অবাধ্য শয়তানগুলোকে বন্দি করে নাও এবং গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো। যাতে আমার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোযাদারদেরকে পথভ্রষ্ট ও ক্ষতি করতে না পারে। (বায়হাকী ৩/৩১২-৩৬৩৩, ৩৬৩৪)

পবিত্র রমাজান মাসের সাথে মহাগ্রন্থ কুরআনে করীম ও অপরাপর আসমানী কিতাবসমূহের সম্পর্ক :

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যে চারটি বড় আসমানী কিতাব নাযিল করেছিলেন সব কয়টি মাহে রমাজানে নাযিল করেছেন। তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল এবং সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনে করীম রমাজান মাসেই অবতীর্ণ করেছেন। এ মাসেই পবিত্র কুরআনে করীমকে লওহে মাহফুজ থেকে নিচের আসমানে নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"রমাজান মাস যে মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "হযরত জিবরাঈল (আ.) রমাজানের প্রতিরাতে আগমন করতেন এবং কুরআন শরীফ দাওর করতেন।" (বুখারী ২/৫৮৬-১৯০২)

রোযার মতো আমলের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই মাসকেই নির্ধারিত করেছেন। রমাজান মাসের ফজীলতের চেয়ে কী হতে পারে।

রমাজান মাসের উল্লেখিত ফজীলত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মুসলমানগণের উচিত এই মাসে ইবাদতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং সময় অপচয় না করা। রাত-দিন সর্বদা ভালো কাজ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকা।

অন্য মাসের স্থায়ী ইবাদতের সাথে বিশেষ কিছু ইবাদতকে এই পবিত্র মাসে নির্ধারিত করার মাধ্যমে শরীয়তের উদ্দেশ্য এমনটিই বোঝা যায় যে, এই পবিত্র মাসের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত এবং রিয়াজতের মধ্যে অতিবাহিত হউক। কিন্তু মানবীয় প্রয়োজনে মানুষ এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যে, দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং মানবিক চাহিদাগুলো থেকে পরিপূর্ণ পৃথক হয়ে সর্বদা ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত থাকা মানব সমাজের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। তাই মানুষের দুর্বলতা, অপারগতা, প্রয়োজনের চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে মহান রাব্বুল আলামীন বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী করে এই পবিত্র মাসে এমনভাবে ইবাদত কে ফরজ করেছেন যে, মানুষ যেন ওই ইবাদতের সাথে নিজের সব কাজকর্ম যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন এবং ইবাদতও আদায় করতে পারেন। এই বিশেষ প্রকারের ইবাদতকে রোযা বলা হয়। রোযা এমন এক আশ্চর্যজনক অনন্য ইবাদত, মানুষ রোযা রেখে নিজের সব কাজ আঞ্জাম দিতে পারে এবং কাজের সাথে সাথে রোযার ছওয়াবও পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই পবিত্র মাসের সঠিক মূল্যায়নের তাওফীক দান করুন। আমীন।

পবিত্র রমাজান মাসে আমাদের করণীয় :

১. নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করা।

২. তাওবা, ইস্তিগফারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

৩. রমাজানের আগমনের ওপর আনন্দিত হওয়া। যাতে আত্মশুদ্ধি ও খোদাভীতি অর্জনের তাওফীক হয়। গোনাহের অথৈ সমুদ্র থেকে রহমতের সাহারা হাসিল হয়।

৪. পরিপূর্ণ আদব ও শিষ্টাচারের সাথে রোযা রাখা।

৫. তারাবীহর মধ্যে মনযোগী হওয়া।

৬. অলসতা পরিহার করা।

৭. বিশেষ করে শেষ দশ দিনে শবে কৃদরের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করা।

৮. ভাব গাম্ভীর্যতা নিয়ে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত করা। এমনকি অনেকবার পরিপূর্ণ খতমে কুরআনের চেষ্টা করা।

৯. রমাজান মাসে উমরা করা।

১০. এই পবিত্র মাসে সদকার ছওয়াব দ্বিগুণ হয়ে যায় বিধায় বেশি বেশি সদকা করা।

১১. ই'তিকাফ করা।

রোযার সংজ্ঞা :

আরবী শব্দ সওম ফার্সি শব্দ রোযা। আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় রোযা বলা হয় নিয়্যাতসহ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

মুমিনদের ওপর রোযা কেন ফরজ করা হয়েছে ?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির মধ্যে বৈপরীত্যময় দুইটা শক্তির সমন্বয় করেছেন। একটা পাশবিক শক্তি অপরটা ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট তথা রূহানী শক্তি। আবার মানবকূলের ইহ ও পরকালীন সফলতা নিহিত রেখেছেন পাশবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে রূহানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার ওপর। আর তা নির্ভর করে জাগতিক খানাপিনা ও হরেক রকম মনের চাহিদা থেকে বিরত থাকার ওপর। তাই কোনো মানুষ যদি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হালাল করে দেওয়া বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এর দ্বারা তার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করে দেওয়া বস্তু ও কর্মকাণ্ড পরিহার করা সহজ হয়ে যাবে। যা হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। এই তাকওয়া বা খোদভীতিই মানব জীবনের মূল সফলতা ও স্বার্থকতা। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের ওপর রোযা ফরজ করেছেন।

রোযা কাদের ওপর ফরজ?

নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ওপর রোযা ফরজ :

১. মুসলমান হওয়া। ২. বালেগ হওয়া। ৩. আক্বেল হওয়া অর্থাৎ বুদ্ধি, বিবেকসম্পন্ন হওয়া। পাগল না হওয়া। ৪. মুকীম হওয়া। মুসাফির না হওয়া। ৫. রোযা রাখার সামর্থ্য ও শক্তি থাকা। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে হায়েজ ও নেফাস থেকে মুক্ত থাকাও জরুরি।

রোযা কত প্রকারের হয় :

সাধারণত রোযা ছয় প্রকারের হয়। ১. ফরজ। ২. ওয়াজিব। ৩. সুন্নাত। ৪. মুস্তাহাব। ৫. নফল ও ৬. মাকরূহ।

১. ফরজ, রমাজান মাসের রোযা, কাফফারার রোযা।

২. ওয়াজিব, মান্নাতের রোযা, নফল রোযার কাজা।

৩. সুন্নাত, আশুরার রোযা।

৪. মুস্তাহাব, প্রতি চন্দ্র মাসে তিনটি করে রোযা রাখা। প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ইত্যাদি।

৫, নফল, উল্লিখিত রোযা ছাড়া অন্য যে কোনো সময় রোযা রাখা। (শরীয়ত নিষিদ্ধ দিবস ব্যতীত)

৬. মাকরূহ, দুই ঈদের দিন এবং জিলহজ্ব মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ। তথা আইয়ামে তাশরীকের রোযা রাখা মাকরূহে তাহরীমী।

তদ্রুপ নববর্ষের রোযা, বিশেষ দিনের রোযা, সারা দিন রোযা রেখে সূর্যাস্তের সময় ইফতার না করে আগের দিনের রোযাকে পরের দিনের রোযার সাথে মিলিয়ে রোযা রাখা। সারা বছর ধারাবাহিকভাবে লাগাতার প্রতিদিন রোযা রাখা।

তবে আশুরার দিনে শুধু মাত্র একটা রোযা রাখা মাকরূহে তানযীহী। তাই সুন্নাত হলো আগে বা পরে আরেকটা রোযা মিলিয়ে রাখা।

রোযার নিয়্যাত :

রোযা যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ একটি ইবাদত, সেহেতু এর জন্য নিয়্যাত আবশ্যকীয়। কেননা সকল আমল নির্ভরশীল নিয়্যাতের ওপর। নিয়্যাতের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিটি আমলের প্রতিদান দেওয়া হয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন, "সকল আমল নিয়্যাতের ওপরই ভিত্তি, তবে নিয়্যাত এটা অন্তরের কাজ মুখের কাজ না। তাই কোনো কিছুর নিয়্যাত করার জন্য মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। অন্তরে নিয়্যাত করলে যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও যারা ভালো আরবী উচ্চারণ করতে সক্ষম তাদের জন্য আরবীতে নিয়্যাত করা উত্তম। যেমন–

نويت ان اصوم غدا من شهر رمضان المبارك

অথবা بصوم غد نويت "আমি আগামীকল্য রমাজান মাসের অথবা আগামীকল্য রোযার নিয়ত করলাম।"

রমাজান মাসের প্রতিটি রোযার জন্য নিয়্যাত করতে হবে তবে সাহরীতে ওঠা এবং সাহরী খাওয়া এবং পরের দিন রোযা ছেড়ে দেয়ার নিয়্যাত না করলেও রোযার নিয়্যাত করেছে বলে ধর্তব্য হবে। মনে রাখতে হবে যে, রমাজানের রোযার নিয়্যাত রাত্রে করা জরুরি নয়। রোযার দিন দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত নিয়্যাত করলে যথেষ্ট হবে।

রমাজানে যদি কোনো ব্যক্তি নফল অথবা ক্বাজা রোযার নিয়্যাত করে তবুও রমাজানের রোযাই হবে। কেননা রমাজান মাসে অন্য কোনো রোযা রাখা জায়েয নাই।

যে সমস্ত রোযার নিয়্যাত রাতে করা জরুরি:

১. রমাজানের ক্বাজা রোযা। ২. নজরে গায়রে মুআয়্যিনের রোযা অর্থাৎ অনির্ধারিত মান্নাতের রোযা। ৩. নফলের ক্বাজা রোযা। ৪. কাফফারার রোযা।

উল্লেখিত রোযাগুলোর নিয়্যাত রাতে না করলে রোযা শুদ্ধ হবে না। তাই সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়্যাত করা জরুরি।

যে সমস্ত রোযার নিয়্যাত রাতে করা জরুরি নয় :

১. রমাজান মাসের রোযা। ২. নজরে মুআয়্যিনের রোযা। অর্থাৎ নির্ধারিত দিনের মান্নতের রোযা। ৩. নফল রোযা উল্লিখিত রোযার নিয়্যাত সুবহে সাদিকের পূর্বে করা জরুরি নয়। বরং দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়্যাত করলেও হয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট : মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ সফলতাই যেহেতু আত্মশুদ্ধি তথা তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জনের ওপর নির্ভরশীল। আর এই অমূল্য রত্ন অর্জনের সুযোগ আল্লাহ রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য অপার কৃপা ও মেহেরবানী। তাই আল্লাহ প্রদত্ত মহা নিয়ামতকে সকল ফরায়েজ, ওয়াজিবাত ও মুস্তাহাব সহকারে আদায় করার মাধ্যমে নিজেকে গোনাহ ও পাপমুক্ত করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অপরিহার্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

তাসহীহে কুরআনের অপরিহার্যতা

মাওলানা ক্বারী জসীমুদ্দীন

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

"আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং তার হেফাজতের দায়িত্বও আমি নিজেই গ্রহণ করেছি।" (সূরা হিজর ৯)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

"আমি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো।" (সূরা ইউসুফ আয়াত ৩২)

কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা বিশুদ্ধ আরবীতেই নাযিল করেছেন। তাই কুরআন বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে পড়তে হবে। বিশুদ্ধভাবে কুরআন শরীফের তেলাওয়াতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ورتل القرآن ترتيلا

"তুমি তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করো।"(সূরা মুযাম্মিল ৪)

তারতীল সম্পর্কে আলী (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف

"তারতীল হলো আরবী অক্ষরগুলো বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করা এবং ওয়াকফ ও ইবতিদা (তথা কোনো শব্দে গিয়ে থামতে হয় এবং কোনো শব্দ থেকে আরম্ভ করতে হয়) সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত হওয়া।

عن البراء بن عازبؓ زينوا القرآن بأصواتكم وفي رواية فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا۔

হযরত বারা ইবনে আযিব সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তোমরা সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করো। কেননা তা কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (মুসনাদে আহমদ ৪/২৮৫ হাদীস নং ১৮৫১৬, ইবনে মাজাহ ২/৩১ হাদীস নং ১৩৪২, আবু দাউদ ২/১৫০ হাদীস নং ১৪৬৮)

عن انسؓ قال قال رسول الله ﷺ لابى بن كعب ان الله امرنى ان اقرأ عليك القرآن قال الله سمانى لك قال نعم قال قد ذكرت عندرب العالمين قال نعم فذرفت عيناه وفى رواية ان الله امرنى ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسمانى قال نعم فبكى۔

হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উবাই ইবনে কা'বকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমার সামনে কুরআনে করীমের তেলাওয়াত করি। হযরত উবাই (রা.) এ কথা শোনার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার কাছে আমার নাম নির্ধারণ করেছেন? উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত উবাই পুনরায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, রাব্বুল আলামীনের দরবারে কি আমাকে স্মরণ করা হয়েছে? জবাবে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। এ জবাব শুনে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। (বুখারী ৬/৪০৪ হাদীস নং ৪৯৬০-৬১, মুসলিম ১/৫৫০, হাদীস নং ৭৯৯)

অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উবাইকে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

তোমাকে – لم يكن الذين كفروا অর্থাৎ (সূরায়ে বায়্যিনাহ) শোনাতে। পরে হযরত উবাই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ কি আমার নাম নির্ধারণ করেছেন, জবাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হ্যাঁ বললে হযরত উবাই বিন কা'আব খুশিতে আত্মহারা হয়ে অশ্রুসজল হয়ে পড়েন। (বুখারী ৪/৬০৩ হাদীস নং ৮০৯ ও মুসলিম ১/৫৫০ হাদীস নং ৭৯৯)

যার নাম আল্লাহ তা'আলা নিজেই উচ্চারণ করবেন তিনি কতই না মর্যাদাবান হবেন।

হযরত উবায় এর কাছে কী গুণ ছিল? যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাকে কুরআন শোনানোর জন্য। তার মূল গুণ ছিল তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করতে পারা। তিনি সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্বারী ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন اقرأكم ابى "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্বারী হলো উবায় ইবনে কা'আব।

عن يعلى بن مملك انه سأل ام سلمة عن قراءة النبى ﷺ فاذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفاحرفا

হযরত ইয়া'লা ইবনে মামলাক (রা.) একদা হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) কে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিটি হরফ সুস্পষ্ট উচ্চারণ করেই কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এমন ধীরগতিতে তেলাওয়াত করতেন, যে

কেউ ইচ্ছা করলে প্রতিটি হরফ গণনা করতে সক্ষম হতো। তার অর্থ হলো, পরিপূর্ণ তাজবীদ সহকারে স্পষ্ট উচ্চারণে তেলাওয়াত করতেন। (তিরমিযী ৫/১৬৭ হা: নং ৩৯২৩, আবু দাউদ ২/১৫৪ হা: নং ১৪৬৫)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা তাজবীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিষদ ধারণা পাওয়া যায়। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, একটি মাত্র সূরা সুস্পষ্টভাবে ধীর গতীতে পূর্ণ তাজবীদ সহকারে পড়া আমার নিকট তাজবীদবিহীন পূর্ণ কুরআন পড়ার চেয়ে উত্তম ও প্রিয়। (মিরকাত)

عن قتادة قال سئل انس كيف كانت قراءة النبى ﷺ فقال كانت مدامدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم ـ

হযরত ক্বাতাদা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তেলাওয়াত কেমন ছিল? উত্তরে আনাস (রা.) বলেন, তাঁর তেলাওয়াত ছিল মদ বিশিষ্ট। (অর্থাৎ তাজবীদ অনুযায়ী, যেখানে মদ করা (টেনে পড়া) দরকার সেখানে মদ করে পড়তেন। অতঃপর আনাস (রা.) বিসমিল্লাহ তেলাওয়াত করে শোনালেন এবং বললেন بسم الله শব্দে الله শব্দটাকে টেনে পড়তেন, الرحمن কে মদ সহকারে পড়তেন। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরো কুরআন মজীদ এভাবেই পড়তেন। যেখানে ১ আলিফ মদ করা জরুরি সেখানে ১ আলিফ আর যেখানে ২ আলিফ বা ৩ আলিফ মদ করা দরকার সেখানে ২, ৩ আলিফ পর্যন্ত মদ করে পড়তেন। (বুখারী ৬/৪২৩ হা: নং ৫০৪৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন–

ليس منا من لم يتغن بالقرآن

এই হাদীসে لم يتغن শব্দটির একাধিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি অর্থ হলো لم يحسن صوته যে সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করবে না। ২। لم يترنم به যে সুর দিয়ে পড়বে না। ৩। لم يجهر به যে উচ্চৈস্বরে পড়বে না। তাহলে হাদীসের পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায়, "যে ব্যক্তি সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে বা উঁচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করবে না সে আমার সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী হবে না।" (বুখারী ৮/৫৭৪, হা: নং ৭৫২৭)

উক্ত হাদীসের ব্যাপক মর্মার্থ অর্জন করার একমাত্র উপায় হলো কুরআন সহীহ পড়ার উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের জন্য কোনো বিজ্ঞ ক্বারীর নিকট পরিপূর্ণ মেহনত ব্যয় করা। অন্যথায় মধুর সুর তো দূরের কথা, কুরআনের হরফ ও হরকত পর্যন্ত ঠিক হবে না।

উল্লিখিত হাদীস ও কুরআনের আয়াত থেকে অনুমান করা যায় তাজবীদ বা বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব কতটুকু।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তবয়ে তাবেয়ীনদের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কুরআনের প্রতি তাঁরা কী রকম উৎসাহী ছিলেন? তাঁরা শুধু উৎসাহী ছিলেন না বরং তারা ভালো কাজের ময়দানে পরস্পর প্রতিযোগীও ছিলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে শুধু কুরআনের অর্থ শিখাননি বরং সর্বপ্রথম কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও বাক্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে শিখে নিয়ে বারবার উচ্চারণ করতেন। যেন ভুলে না যায় এবং অশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদূরিত হয়। কুরআন শিক্ষার এত গুরুত্ব ছিল যে, অনেক সময় বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো কোনো মহিলা কুরআন শিক্ষাকে অর্থাৎ সুন্দর ও শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারাকে মোহর হিসেবে গ্রহণ করে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম সব কাজকর্ম ছেড়ে কুরআন শিক্ষার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা সর্বদা কুরআন পড়তেন, কুরআন শুদ্ধ করার পেছনে অপরিসীম মেহনত চালিয়ে যেতেন।

বিখ্যাত সাহাবী উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা আসতেন তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আমাদের (আনসারদের) মধ্য থেকে কারো কাছে সোপর্দ করতেন, তাকে কুরআন শিখানোর জন্য। মসজিদে নববীতে কুরআন শিখা ও শিখানোর কারণে এমন উঁচু আওয়াজ হতো যে, কোনো কোনো সময় স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্দেশ দিতে হয়েছে, তোমাদের আওয়াজ আরো ছোট করো।

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর সাহাবাদের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতের চর্চা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন থেকে কুরআন তেলাওয়াতের চর্চা এবং পরস্পরকে শিক্ষাদান ইত্যাদির মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন এক বড় জমা'আত তৈরি হয় যাদেরকে قراء صحابه তথা সাহাবাদের ক্বারী দল বলা হতো। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন–

১. হযরত আবু বকর (রা.) ২. হযরত উমর (রা.) ৩. হযরত উছমান (রা.) ৪. হযরত আলী (রা.) ৫. হযরত তালহা (রা.) ৬. হযরত সা'দ (রা.) ৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ৮. হযরত হুজায়ফা বিন য়ামান (রা.) ৯. হযরত সালেম মাওলা আবী হুজাইফা (রা.) ১০ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) প্রমুখসহ আরো অনেকে।

এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় আরেকটি হাদীসে। যে হাদীসে বলা হয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কোনো সময় এক গোত্রের কাছে ৭০ জন ক্বারী পাঠিয়েছিলেন।

বীরে মাউ'নার যুদ্ধে ৭০ জন ক্বারী শহীদ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা হাদীস শরীফে আছে। অনুরূপভাবে ৭০ জন ক্বারী ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে ইসলামের ইতিহাসে। অন্য এক বর্ণনায় ইয়ামামার যুদ্ধে সাতশ ক্বারী শাহাদাত বরণ করার কথা বলা হয়েছে। (উলূমুল কুরআন, মুফতী তাকী উসমানী)

সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগের মাতৃভাষা ছিল আরবী। আবার কুরআনও আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। সে হিসেবে অল্প মেহনত করলেই তাঁদের কুরআন আয়ত্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আসমানী কিতাব যেভাবে নাযিল হয় সেভাবেই তা উচ্চারণ ও পড়তে হয় বিধায় তাঁরা পরিপূর্ণ রূপে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার জন্য অনন্ত চেষ্টা চালিয়ে সফলতার উচ্চ শিখরে আসিন হয়েছেন। যদি সাহাবীগণ আরবের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের জন্য তাঁদের এত মেহনতের প্রয়োজন ছিল তাহলে আমরা যারা আজমী (অনারব) তারা কি কোনো মেহনত ছাড়াই এমনিতেই বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম হব? সাহাবায়ে কেরামের যোগ্যতার সাথে আমাদের যোগ্যতার কোনোই তুলনা হয় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম যে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আজো সারা দুনিয়ায় চির ভাস্বর। এরূপ যোগ্যতা সত্ত্বেও তাদের যদি কুরআন তেলাওয়াতের বিশুদ্ধতার জন্য এত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে হয় তবে আমাদের মতো হীন ও দুর্বলরা কি কোনো চেষ্টা ছাড়াই তা অর্জন করতে পারব? তা কখনও হতে পারে না। সুতরাং কুরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে হলে আমাদের অপরিসীম মেহনত ও চেষ্টা করতে হবে।

যুক্তির আলোকে তাজবীদুল কুরআনের আবশ্যিকতা :

উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনায় কুরআন, হাদীসের আলোকে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব পেশ করা হয়েছে। এখন আমরা দেখব যুক্তির নিরিখে বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত প্রত্যেক ভাষার কিছু ভাষাগত চাহিদা থাকে। যেমন আমরা বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা ভাষারও কিছু শৈলী, উচ্চারণভিত্তিক চাহিদা আছে। ওসব চাহিদা পরিপূর্ণভাবে পুরণ না হলে অনেক ক্ষেত্রে অর্থ পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়। যেমন বাংলা ভাষায় দুটি শব্দ আছে। ১. পুল। ২. ফুল। পুল অর্থ সেতু। ফুল অর্থ পুষ্প। সেরূপ কলা এবং খলা। কলা হলো একটি ফল আর খলা হলো ধান মাড়ানোর বা শুকানোর জন্য বিস্তৃত স্থান। কেউ যদি ফুলের স্থলে পুল বলে বা তার উল্টো বলে কিংবা কলার স্থলে যদি খলা বলে তবে নিশ্চয় অর্থ ঠিক থাকবে না। অথচ এগুলো নিতান্তই উচ্চারণের ত্রুটি। উচ্চারণের ত্রুটি হলেও অশুদ্ধটা হচ্ছে মস্তবড় অশুদ্ধ।

উচ্চারণিক বিশুদ্ধতা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরবী ভাষার ক্ষেত্রে। আবার তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বিশুদ্ধ এবং সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআন মজীদ নাযিল করেছি এবং এভাবেই আমি কুরআনকে হেফাজত করব।

পবিত্র কুরআনে انـطـق শব্দটি ط এর সাথে। সূরা হামিম সজিদা ২১ নং আয়াতে রয়েছে। তার অর্থ হলো কথা বলানো। আয়াতের সারমর্ম হলো এই, যখন কিয়ামত দিবসে কাফিররা আল্লাহর দরবারে তাদের বদ আমল অস্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে তালা লাগিয়ে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা চোখ, কান, চামড়া ইত্যাদির সাহায্যে কথা বলাবেন। ওসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রদান করবে। তখন কাফিররা ওসব অঙ্গপ্রতঙ্গকে সম্বোধন করে বলবে, কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিচ্ছ। তখন নির্দেশপ্রাপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জবাব দেবে, আমাদেরকে মহান আল্লাহ কথা বলাচ্ছেন, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। যদি উল্লিখিত শব্দ তথা انـطـق এর ط এর সঠিক উচ্চারণ না করে ت এর উচ্চারণ করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হয়েছেন, যিনি সব বস্তুর সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হন। (নাউজু বিল্লাহ)

একটি বর্ণের উচ্চারণ অশুদ্ধ হওয়ার কারণে কুরআনের বাক্যের অর্থের কী অবস্থা হচ্ছে আপনি নিজেই চিন্তা করুন। এমনকি একটি বর্ণের উচ্চারণ অশুদ্ধ হওয়ার কারণে মুমিনের ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এরূপ অশুদ্ধ তেলাওয়াত দিয়ে যদি নামায পড়া হয় তবে নামাযের কী অবস্থা হবে আমরা নিজেই চিন্তা করতে পারি। সে কারণে কোনো উস্তাদের নিকট গিয়ে পবিত্র কুরআনের উচ্চারণ শুদ্ধ করা তাজবীদ সহকারে কুরআন পড়ার প্রশিক্ষণ নেয়ার কোনোই বিকল্প নেই।

বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের নামই হলো তাজবীদ। দুনিয়ায় এমন কোনো ভাষা নেই, যার উচ্চারণ পদ্ধতির নামে পৃথক শাস্ত্র রয়েছে এবং সে শাস্ত্রের কায়দা কানুন ও বিধিবিধান নিয়ে বিশাল সম্ভার রচিত হয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষায় উচ্চারণ বিশুদ্ধতা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়।

এ অধ্যায়ে রচিত হয়েছে বিভিন্ন কিতাবের বিশাল সম্ভার। এর কারণ হলো, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। পবিত্র কুরআনে আছে يتلو عليهم آياته অর্থাৎ তাদের কাছে পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করবে। যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে হিফাজত করবেন বলে ঘোণা দিয়েছেন সে হেফাজতের মধ্যে এর তেলাওয়াতের হিফাজতও নিহিত রয়েছে। যেভাবে তিনি কুরআনের অন্যান্য বিষয়কে হিফাজত করবেন এবং কুরআনের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ লোক তৈরি হওয়া এবং প্রত্যেক বিষয় কিতাবের কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়া অবশ্যই তার প্রমাণ বহন করে। শুধু এক যুগ নয় বরং যুগ যুগ ধরে তা চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কোনো জাতি যদি তা ছেড়ে দেয় তবে দেখা যাবে অন্য কারো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ সম্পাদন করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামী ফিকহের আলোকে তাজবীদের হুকুম :

শরীয়তে তাজবীদসহকারে কুরআন তেলাওয়াত করা প্রত্যেক সাবালক নর-নারীর ওপর 'ফরযে আইন'। অর্থাৎ অবশ্য পালনীয়। যা শরয়ী অপারগতা ব্যতীত ছাড়া যায় না।

সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত ফক্বীহ ও ক্বারী আল্লামা শামশুদ্দীন আবুল খাইর মুহাম্মদ আলজযরী (রহ.) তাঁর রচিত কিতাবে লেখেন–

والاخذ بالتجويد حتم لازم
من لم يجود القرآن آثم
لانه به الا اليه انزلا
وهكذا منه الينا وصلا

"তাজবীদের ওপর আমল (তাজবীদ সহকারে) কুরআন পড়া ফরজে আইন এবং যে ব্যক্তি তাজবীদ সহকারে কুরআন পড়বে না সে গোনাহগার ও পাপী। কেননা তাজবীদ সহকারেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন এবং তাজবীদের সাথে ধারাবাহিকভাবে আমরা পর্যন্ত পৌঁছেছে। যুহদুল মুক্বিল গ্রন্থে এই হুকুম এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

ثم هذا العلم لا خلاف فى انه فرض كفاية ، والعمل به فرض عين اراد من العمل به تجريدا لكلمة عن اللحن الجلى واما تجريده عن اللحن الخفى فبعضه واجب وبعضه مستحب۔

"তাজবীদের ইলম অর্জন করা ফরজে কিফায়া এবং তাজবীদের ওপর আমল করা তথা তাজবীদ সহকারে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা ফরজে আইন। তাজবীদের সাথে কুরআন পড়ার অর্থ হলো কুরআনের শব্দগুলোকে লাহানে জলী মুক্ত করা। লাহনে খফী থেকে হেফাজত করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়াজিব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুস্তাহাব।"

ফতওয়ার সারমর্ম হলো, কুরআনকে এমনভাবে শুদ্ধ করে পড়া, যাতে অন্য কোনো অশুদ্ধ অর্থ সৃষ্টি না হয়। যেমন কুরআনে জান্নাতবাসী সম্পর্কে বলা হয়েছে وندخلهم ظلاظليلا অর্থাৎ আমি তাঁদেরকে ঘণ ছায়ায় (জান্নাতে) প্রবেশ করিয়ে দেব। এখানে যদি ظ এর স্থলে ذ এর উচ্চারণ হয়, তাহলে অর্থ হবে, আমি তাঁদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছনার দিকে ঠেলে দেব। এই অর্থ জান্নাতবাসীদের জন্য কখনো কল্পনা করা যায় না।

কুরআনের বিকৃতি এভাবে হয়ে যায় যে, আরবী হরফ এর পরিবর্তে কোনো আজমী হরফ উচ্চারণ করা যেমন د এর পরিবর্তে D এর উচ্চারণ যেটা আরবীতে নেই। সেরূপ ت এর উচ্চারণ T দিয়ে করা। কোনো ওযর বা অপারগতা ছাড়া কেউ যদি সেরূপ উচ্চারণ করে তবে সে হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণে গোনাহগার হবে। নামাযে কুরআন আরবীতেই পড়তে হবে। অন্য ভাষায় কেরাত পড়লে নামায হবে না। এর ওপর সমস্ত ফুকাহা ও ইমামগণ এমনকি পুরো উম্মত একমত। কোনো ব্যক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও যদি সঠিকভাবে আরবী পড়তে না পারে তবে তাকে অপারগ বা মা'যূর ধরা হবে।

খাইরুল ফতাওয়া ২/৩০০ তে আছে–

যদি কেউ ص এর স্থলে س এর উচ্চারণ করে তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যারা ص এবং س উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না তারা অক্ষম ও মা'যুর বিবেচিত হবে, তাদের নামায হয়ে যাবে।

অনুরূপ যদি কেউ يوم تشقق الارض এর স্থলে سرا عنهم سراعا পড়ে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। প্রাগুক্ত ২/৩০৪)

যে লোক শরীয়তের নীতিমালায় মা'যূর বা অপারগ নয় বরং অলসতা ও গুরুত্বহীনতার কারণে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা গ্রহণ করেননি সে কারণে বিশুদ্ধ কুরআন পড়তে পারেন না তাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী মা'যূর বা অপারগ ধরা যাবে না। বরং সে লোক গোনাহগার হবে। যতক্ষণ না সে শুদ্ধ করে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শিখে নেয়। (ইমদাদুল ফতাওয়াতে উদাহরণ সহকারে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে)

পবিত্র কুরআনের প্রতি বর্তমান উম্মতের অবহেলা :

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, সেই স্বর্ণ যুগ থেকে গত শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এমন কোনো যুগ বা শতাব্দী পাওয়া যায় না যে যুগে আলিমগণ এ বিষয়ে অবহেলা করেছেন বরং তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার পর পরই এ বিষয়ে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করতেন।

বিখ্যাত তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান কূফার জামে মসজিদে কুরআনের পাঠ

দান করতেন। এবং তিনি –

خيركم من تعلم القرآن الخ , خيركم من قرأ القرآن واقرأه

হাদীসদুটি হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণনা করতেন। হাদীস দুটি বর্ণনা করার সময় তিনি মসজিদের স্থানটির দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, এই হাদীস দ্বয় আমাকে এখানে বসতে বাধ্য করেছে। তিনি এত বড় ফক্বীহ হওয়া সত্ত্বেও অন্য সব ব্যস্ততার ওপর কুরআন শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বিখ্যাত ফতওয়ার কিতাব ফতওয়ায়ে শামীর সংকলক আল্লামা শামী (রহ.) ইলমে কিরাতের একজন পারদর্শী আলেম ছিলেন।

বিজ্ঞ মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) তো বিশ্ব সেরা ক্বারীদের একজন ছিলেন। তিনি ক্বারী হিসেবেই প্রসিদ্ধ। এরূপ দুনিয়ার বড় বড় মুহাদ্দিস, ফক্বীহগণের মধ্যে অনেকে বড় বড় ক্বারী ছিলেন। আবার প্রায়ই যদিও ক্বারী হিসেবে নাম ডাক না থাকলেও তাজবীদ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কুরআন সহীহ শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। আমাদের আকাবির উলামাদের সকলেই কুরআন শুদ্ধ পড়ার প্রতি অতীব গুরুত্ব দিতেন। নিকট অতীতেও প্রায় সকল মুসলিম শিশু বরকতময় কুরআনের আয়াত দিয়েই তাদের পড়ালেখার সূচনা করত। তা থেকে বোঝা যায়, পুরো মুসলিম ইতিহাসে প্রায় মুসলমানই তাদের শিশুদের মুখ থেকে সর্বপ্রথম উচ্চারিত বাক্য ছিল কুরআনের বরকতপূর্ণ আয়াত। কুরআন মজীদের তেলাওয়াত দিয়েই তাদের শিক্ষা আরম্ভ হতো। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় শুধু আমাদের দেশের কথাই বলি বেশিরভাগ মুসলিম শিশু বিশেষ করে যারা শহরে বন্দরে বেড়ে ওঠে তারা এই মহান বরকত থেকে বঞ্চিতই দেখা যায়। তা অবশ্যই মুসলিম উম্মাহের জন্য সুখকর খবর নয়।

এসব তো শিশুদের কুরআন শিক্ষার অবস্থা। কিন্তু দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় কথিত ইসলামিক স্কলার, ইসলামী চিন্তাবিদ এমনও আছে, যারা স্বয়ং কুরআনের শুদ্ধ তেলাওয়াত জানে না। কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় দেখা যাবে খুবই বাকপটু। কিন্তু সঠিকভাবে শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে শুদ্ধভাবে কুরআনের তেলাওয়াত করতে পারে না। অবস্থা দেখলে বুঝা যায়, কুরআন যে শুদ্ধ করে পড়তে হয় এর অনুভূতিও তাঁর কাছে নেই। অথচ তিনি বড় ইসলামী চিন্তাবিদ (!)

অথচ কুরআন যেটুকু পড়বে তা শুদ্ধভাবে পড়া আবশ্যক। নামাযে পবিত্র কুরআনের শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটে যদি অর্থ বিকৃতির অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে নামাযও হবে না। হাদীস শরীফে কুরআন তেলাওয়াতের যে ফজীলতের কথা বলা হয়েছে তা শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কুরআন তেলাওয়াত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের উদ্দেশ্যসমূহে স্বতন্ত্র একটি উদ্দেশ্যও বটে।

সহিহ শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের এতসব গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা থাকার পরও কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ কর্তৃক সে দিকটার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া, অথচ মিডিয়াতে নিজেকে ইসলামের বড় কর্ণধার হিসেবে পরিচয় তুলে ধরা পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয়ই মনে হয়। কারণ যেখানে পবিত্র কুরআনই শুদ্ধ করে পড়তে পারবে না সেখানে তাঁর নামায ও অন্যান্য ইবাদত হচ্ছে কি না সন্দেহ। যে লোকের মূল ইবাদতই ঠিক হওয়া না হওয়ার মধ্যে সন্দেহ, তাঁর পক্ষে নিজে ইসলামী চিন্তাবিদ, স্কলার হিসেবে পরিচয় দেয়া, বা তাঁর হয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁকে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা কতখানি সংগত তা নিশ্চয় মুসলমানগণ নিজের বিবেচনাধীন রাখতে পারেন।

মোটকথা, বলতে গেলে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি যেমন সর্বস্তরে অবহেলা তেমনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের চেষ্টার প্রতি আরো বেশি অবহেলা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয় বর্তমান সময়ে।

বর্তমানে প্রায় মাদরাসায় তাজবীদ বিভাগ আছে। যেখানে রীতিমতো কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ করার জন্য ক্বারীগণ আছেন। একসময় মাদরাসাসমূহে এই বিভাগ থেকে পুরো মাদরাসার ছাত্রদের কিরাত ও তেলাওয়াত শুদ্ধ করানোর বিশেষ ব্যবস্থা থাকত, সাথে কর্তৃপক্ষের চাপও থাকত ছাত্রদের ওপর। সম্প্রতি সেখানেও বিষয়টির গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

আগেকার যুগে বড় বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফতী, ইমাম সকলে কুরআনের তেলাওয়াত শুদ্ধ করার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। বর্তমান সময়ে পড়ালেখায় ছাত্ররা সামান্য ভালো হলে তাজবীদ বিভাগ বা সহীহ শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত প্রশিক্ষণ বিভাগকে তার মেধার তুলনায় হয়তো নিচের স্তরের মনে করা হয়। সে কারণে মেধাবীগণ তাজবীদে কুরআনের প্রতি ধাবিত হয় না।

শিশুকাল থেকে কুরআন শুদ্ধ করার যে নিয়ম ছিল তাও অনুপস্থিত, বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদদের কাছ থেকে উৎসাহিত হয়ে মুসলমানগণ কুরআন শুদ্ধ করার কথা ছিল, এখন তাও অনুপস্থিত, মাদরাসাসমূহে ব্যাপক হারে কুরআন শুদ্ধ করার যে নিয়ম ছিল তাও নিম্নগামী, মেধাবীদের অংশগ্রহণে সমাজে যে উৎসাহ সৃষ্টি হতো তাও শূণ্যের কোটায়, ব্যাপকহারে মুসলমানদের কুরআন তেলাওয়াতের যে ধারা অব্যাহত ছিল তাও যেন এখন ইতিহাস আর ইতিহাসই হয়ে যাচ্ছে।

(বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্মরণ
আওলিয়া জীবন

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা
সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

জন্ম ও বংশ পরিচয় :
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ১৯ শে শাওয়াল ১২৯৬ হিঃ মোতাবেক ১৮৭৯ঈসায়ী সনে ভারতের উনও জেলার অন্তর্গত বাংগার মৌ গ্রামে জনাব সায়্যিদ হাবীবুল্লাহর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশপরিক্রমা ৩৩ সূত্রে সায়্যিদ হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়। (১)

প্রাথমিক শিক্ষা :
তিনি ৫ বছর বয়স থেকে তের বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের ফয়েজ আবাদ জিলার ইলাহদাদপুর গ্রামে নিজ পিতার তত্ত্বাবধানে অর্জন করেন। এবং কায়েদায়ে বাগদাদী, আমপারাসহ কুরআন শরীফের প্রথম ৫ পারা নিজ মাতার নিকট পড়েন। (২)

দারুল উলূম দেওবন্দে গমন : তারপর তের বছর বয়সে তিনি বৃহৎ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে তিনি মীযান (৫ম শ্রেণী) থেকে দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) পর্যন্ত দরসে নেজামীর তথা দেওবন্দী মাদরাসার প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষা হাসেল করেন। সেখানে তিনি সাড়ে সাত বছরে ১১জন বিজ্ঞ উস্তাদ থেকে প্রায় সত্তরটি কিতাবের শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে শুধু হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর নিকট ২৪টি কিতাব পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। (৩)

হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর দরবারে :
দাওরায়ে হাদীস সমাপনের পর স্বভাবগতভাবে তাঁর মধ্যে আত্মশুদ্ধির আগ্রহ জন্মে। মুরশিদ নির্বাচনে ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় হযরত শায়খুল হিন্দের (রহ.) দিকে। কিন্তু শায়খুল হিন্দ (রহ.) যেহেতু তখন সাধারণভাবে বায়'আত করতেন না, তাই তিনিই মাদানী (রহ.) কে হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর দরবারে পাঠিয়ে দেন। এবং তাঁর মুবারক হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এরপর গাংগুহী (রহ.) বললেন, আপনারা তো হেজায যাচ্ছেন, তাই সেখানে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমল করার জন্য সবক গ্রহণ করবেন। (৪)

মদীনায়ে তায়্যিবায় :
১৩১৬ হিজরীতে তাঁর পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ সাহেব (রহ.) সপরিবারে মদীনায় হিজরত করার নিয়্যাত করেন। কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হিজরত করতে বাধ্য করেননি। তাই হযরত মাদানী (রহ.) তাঁর রূহানী মুরুব্বীগণের পরামর্শক্রমে হিজরতের নিয়্যাত করেননি। শুধু মদীনায় বসবাসের নিয়্যাত করেছেন। মক্কা মুকাররামায় পৌঁছার পর প্রথমে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। এবং হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর নির্দেশ মতে তাঁর কাছ থেকে সবক নেন। এরপর তাঁরা হজ্ব পালন করেন। হজ্ব পালন শেষে বসবাসের উদ্দেশ্যে মদীনায় চলে আসেন। হযরত মাদানী (রহ.) মসজিদে নববীতে ১৩১৭ হিজরী থেকে ১৩৩৩ হিজরী পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিক হাদীসের দরস প্রদান করেন। তবে মাঝখানে ভারতে সফরের কারণে ৪ বছর সেখানে দরস দিতে পারেননি। তাঁর সেই দরসে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মাযহাবের ওলামা, তালাবা উপস্থিত হয়ে পরিতৃপ্ত হতেন। এ দরস তিনি আরবী ভাষায় প্রদান করতেন।

খেলাফত লাভ :
বায়'আত গ্রহণের তিন বছর পর হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর পক্ষ হতে গাংগুহ উপস্থিত হওয়ার আদেশ এলে তিনি ১৩১৯ হিজরীতে সেখানে উপস্থিত হন। এবং কিছুদিন মোজাহাদাহ করানোর পর তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন (৬)

মাল্টার কারাগারে :
১৩৩৫ হিজরীতে তাঁকে এবং তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) কে মক্কা থেকে তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় গ্রেফতার করা হয় এবং আরো কিছু ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে গ্রেফতার করে মাল্টার কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁরা মোট তিন বছর চার মাস কারারুদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করে অবশেষে ২২ জুমাদাসসানী ১৩৩৮ হিজরীতে কারামুক্ত হয়ে হিন্দুস্তান চলে আসেন। (৭)

আযাদী আন্দোলনে : মাল্টার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভারতের আযাদী আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে অংশ নেন। ১৩৩৯ হিজরীসনে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর ওফাত হলে তিনি ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত দেশ ও জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। অতুলনীয় ত্যাগ তিতিক্ষা বরণ করে নেন। (৮)

দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস পদে :
১৩৪৬ হিজরীতে তিনি তৎকালীন মুহতামিম সাহেব ও নায়েবে মুহতামিম সাহেবের পীড়াপীড়িতে এবং হাকীমুল

উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর পরামর্শক্রমে দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যাপারে মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত দেন যে, তিনি দারুল উলূমের সকল আইন কানুনের উর্ধ্বে থাকবেন। তখন থেকে ওফাত পর্যন্ত তিনি এই গুরু দায়িত্ব সুনামের সহিত পালন করেন। সহীহ বুখারী শরীফ ও জামে তিরমিযী শরীফের পাঠদান তাঁর দায়িত্বে রাখা হয়। তাঁর দরসে হাদীসের খুবই গ্রহণযোগ্যতা ছিল। (৯)

তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও দক্ষতার সাথে দুই কিতাবের দরস দিতেন। ছাত্ররা খুব আগ্রহের সাথে তাঁর দরসে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর থেকে দারুল উলূম দেওবন্দে সর্বমোট ৩,০৫৬ তালাবা হাদীসের শিক্ষা লাভে ধন্য হয়েছেন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি :

১৩৬০ হিঃ থেকে ওফাত পর্যন্ত তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। (১০)

আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান :

তিনি ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অগণিত ভক্ত, অনুরাগী আলেম উলামাকে বায়'আতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং দীক্ষাদান করেন। তাঁদের আখিরাতের উন্নতির জন্য দিক নির্দেশনা ও মাশায়েখের উলূম ও মা'আরিফকে প্রচার প্রসার করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। তাঁদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে বিভিন্ন দেশের সর্বমোট ১৬৬জন ওলামাকে তিনি খেলাফত প্রদান করেন।

সমকালীন শীর্ষ ওলামায়েকেরামের দৃষ্টিতে হযরত মাদানী (রহ.) :

১. হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেছেন, হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) হলেন একাধারে ইলম ও হিদায়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। যুহদ ও তাকওয়ায় অদ্বিতীয়। জিহাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় সিপাহ সালার। (১১)

২. দারুল উলূম দেওবন্দের তখনকার মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব (রহ.) বলেন, হযরত মাদানী (রহ.) ছিলেন এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। দৃঢ়তা, অবিচলতা, সাহসিকতা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, গভীর ইলম ও দূরদৃষ্টি, ঈমানপ্রসূত অন্তরদৃষ্টির চলমান প্রতিকৃত। ধর্মহীন ও বস্তুবাদী যুগে সর্বস্তরের মানুষের জন্য তিনি ধর্মীয়, চারিত্রিক ও জ্ঞানগত যে অবদান রেখে গেছেন পৃথিবী তা নিয়ে সর্বদা গর্ব করবে।

৩. হযরত মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান উসমানী (রহ.) তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, হযরত মাদানী (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব কেবল ভারতের জন্য নয়, গোটা এশিয়ার জন্য ছিল গর্বের বিষয়। মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় মাত্র কয়েকজন প্রতিভাধর আলেমের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ইখলাস ও নিষ্ঠা মায়া-মমতা, স্নেহ বাৎসল্য, জ্ঞান পাণ্ডিত্য, মহানুভবতা, ক্ষমাশীলতা, দৃঢ়তা, অবিচলতা, সাহসিকতা, বিনয়-নম্রতা, ধৈর্য্য ও মহত্ব ইত্যাদি গুণাবলির এক অদ্ভুত সমাহার ছিল তাঁর ব্যক্তি সত্তা। (১২)

সুন্নাতে নববীর অনুসরণ :

হযরত মাদানী (রহ.) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুন্নাতের প্রতি সর্বক্ষণ যত্নবান ছিলেন। যখন তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় হেলান দেওয়া ছাড়া বসতে পারতেন না এমনি একদিন বসে ছিলেন বালিশে ভর করে। এমতাবস্থায় তাঁর সামনে খানা পেশ করা হলো। ঘরের কেউ বললেন, এভাবে বসেই খানা খেয়ে নিন। হযরত বললেন, ভাই, "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) টেক লাগিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।" তারপর তিনি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বালিশ থেকে সরে গিয়ে সোজা হয়ে খানা খেলেন। (১৩)

তাঁর সম্মানে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে অত্যন্ত গম্ভীর আওয়াযে বলতেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী "তোমরা অনারবদের মতো আমার সামনে দাঁড়াবে না।" এ কথা জানার পরও আপনারা কেন দাঁড়ান?

বিনয় ও নম্রতা :

বিনয় ও নম্রতা হযরত মাদানী (রহ.)-এর এমন এক বৈশিষ্ট, যার কোনো দৃষ্টান্ত সমসাময়িক মাশায়েখদের মাঝেও লক্ষ করা যায়নি। হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) অতিশয় বিনয়কে তাঁর বৈশিষ্টসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। বিনয়-নম্রতা দৃশ্যত সাধারণ মনে হলেও বস্তুত তা মানব চরিত্রের এমন একটি গুণ, যা মূল্যায়ন করা দুরূহ ব্যাপার।

তাঁর বিনয়ের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা :

অবিভক্ত ভারতের সংগ্রামী জননেতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর সাবরমতী জেল খানায় মাদানী (রহ.)-এর সাথে বন্দি হন। সেখানে তিনি মাদানী (রহ.)-এর নিকট কুরআনের তাফসীর পড়তেন সে কারণে মাওলানা জওহর তাঁকে উস্তাদের মতো সম্মান করতেন। কিন্তু মাদানী (রহ.)-এর বে নফসী, বিনয় দৃষ্টে তিনি অভিভূত হয়ে যান। মাওলানা জওহর সে সময় ডায়াবেটিস রোগে ভুগ ছিলেন। তাই তাঁর কুঠুরীতে পেশাবের একটি পাত্র সব সময় রাখা থাকত। রাতে বারবার পেশাব করার কারণে পাত্র ভরে যেত। সকালে মাওলানা জওহর (রহ.) ঘুম থেকে জেগেই দেখতেন পাত্র স্পূর্ণ খালি এবং পরিষ্কার। দীর্ঘদিন এই রহস্য তাঁর কাছে অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। তিনি আশ্চর্য হতেন এত ভোরে কে এ পাত্র পরিষ্কার করে থাকেন? হঠাৎ এক রাতে মাদানী (রহ.) যখন পাত্রটি পরিষ্কার করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন,

ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর চোখ খুলে যায়। তখন তিনি জানতে পারলেন পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদই প্রিয় সাগরিদের এভাবে আন্তরিক খেদমত করে যাচ্ছেন। (১৪)

ইখলাসের এক অনুপম দৃষ্টান্ত :

হযরত মাদানী (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে পাঁচশত রুপি সম্মানি পেতেন। অনুপস্থিতির বেতন কাটা হতো। মাদরাসার কাজে সফর করলেও সে কয় দিনের সম্মানি নিতেন না। অসুস্থ থাকাকালীন সময়ের সম্মানিও তিনি গ্রহণ করেননি।

ইন্তিকালের পূর্বে অসুস্থজনিত কারণে মাদরাসার পক্ষ থেকে এক মাসের ছুটি প্রদান করা হয়। তা ছাড়া কিছুদিনের নৈমিত্তিক ছুটিও তাঁর পাওনা ছিল। সব মিলিয়ে দুই মাসের বেতন তাঁর নিকট পাঠানো হলো। তিনি বললেন, "আমি তো পড়াতে পারিনি বেতন কেন নেব?" তা বলে তিনি বেতনগুলো ফেরত পাঠালেন।

ওফাতের পূর্বে উপদেশ :

ওফাতের আড়াই ঘণ্টা পূর্বে তিনি বিবি মুহতারামাকে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন, "সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। দুনিয়ার দিকে কখনও নজর দেবে না। বড়দের কথা চুপ করে শুনবে। কাউকে অসন্তুষ্ট করবে না। একমাত্র আল্লাহপাক থেকে পাওয়ার আশা রাখবে। কখনো কারো সমালোচনা করবে না বরং প্রশংসা করবে।" (১৬)

ওফাত :

অবশেষে ১৩ ই জুমাদাল উলা ১৩৭৭ হিজরী বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াই টার সময় উল্লিখিত উপদেশ দানের ঠিক আড়াই ঘন্টা পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। انا لله وانا اليه راجعون তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর ৬ মাস ২৪ দিন। ওই দিন রাত ১২.৪০ মিনিটে তাঁর জানাযার নামায শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। মাকবারায়ে কাসেমীতে আপন প্রাণ প্রিয় উস্তাদ শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর পার্শ্বে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

তথ্য সূত্র :

১. তাযকিরায়ে হযরত মাদানী (রহ.) পৃষ্ঠা-৮। ২. হায়াতে শায়খুল ইসলাম পৃষ্ঠা ১৯। ৩. নকশে হায়াত ১/৪৪। ৪. প্রাগুক্ত ৭৭,৭৮। ৫. প্রাগুক্ত ৫৬,৫৭। ৬. তাযকিরায়ে হযরত মাদানী (রহ.) পৃষ্ঠা ২৭। ৭. হায়াতে শায়খুল ইসলাম পৃষ্ঠা ৩০। ৮. ইয়ে থে শায়খুল ইসলাম পৃষ্ঠা ১৫। ৯. পঁচাস মেছালী শাখসিয়্যাত পৃষ্ঠা ১৫০। ১০. মুকাদ্দিমায়ে ফতাওয়া শায়খুল ইসলাম। ১১. ইয়ে থে শায়খুল ইসলাম ৩৮। ১২. প্রাগুক্ত ৩৯। ১৩. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রহ.) জীবন ও সংগ্রাম পৃষ্ঠা ২৭০। ১৪. প্রাগুক্ত ২৭৪। ১৫. প্রাগুক্ত ২৮৬। ১৬. প্রাগুক্ত ২২৬

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

আল্লাহ তা'আলার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিধান বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এত অবহেলা ও উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়ার পর দুনিয়াতে কুরআনের যে বিশাল বরকত তা কিভাবে অব্যাহত থাকবে? পবিত্র কুরআনের বরকত না থাকলে মুসলমানগণ নিশ্চয় অধঃপতিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে হিসেবে আমরা কি বলতে পারি না? বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহের ক্রম অধঃপতনের বিভিন্ন কারণসমূহে কুরআনের বরকত না পাওয়াও একটি কারণ (?)

দেখি কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে হাদীস শরীফ কী বলে :

عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله ﷺ اشرف امتى حملة القرآن واصحاب الليل

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো হামেলে কুরআন (ক্বারিয়ে কুরআন) এবং তাহাজ্জুদগুজার। (বায়হাকী শুআবুল ঈমান ২/৫৫৬, হা: নং ২৭০৩)

عن عبد الله بن مسعودؓ انه قال خيركم من قرأ القرآن وأقرأه

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো, যে কুরআন মজিদ পড়ে এবং পাঠদান করে। (বুখারী হা: নং ৫০২৭ তাবরানী ১০/২০০, হা: নং ১০৩২৫)

عن ابى هريرةؓ انه قال قال رسول الله ﷺ افضل عبادة امتى قراء ة القرآن

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন আমার উম্মতের সর্বোত্তম ইবাদত হলো কুরআন তেলাওয়াত। (বায়হাকী শু'আবুল ঈমান, ২/৩৫৪, হা: নং ২০২২)

عن ابن عباسؓ قال من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে তাকে কষ্টের জীবনে পতিত করা হবে না। (হাকেম ২/৫২৯, হা:নং৩৯৫২)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের বরকত অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহাম্মদ সোহেল শেখ

লোহাগড়া, নড়াইল।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদটি ছোট, মুসল্লীদের জায়গা সংকুলান হয় না বিধায় সকল মুসল্লী একমত হয়েছে মসজিদটি বড় করার দরকার। অথচ পুরাতন মসজিদটির পাশে চাহিদা অনুযায়ী বড় মসজিদ করার মতো জায়গা জমি নেই। এ জন্য অন্য জায়গায় বেশি জমি পাওয়ায় আমরা মসজিদটি সরিয়ে নিতে চাই। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, শরীয়ত মোতাবেক কী কী করণীয়।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত সেটা মসজিদ হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। সেটাকে ক্রয়-বিক্রয় বা স্থানান্তর করা যায় না বিধায় উক্ত মসজিদে জায়গা সংকুলান না হলে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। আর নতুন মসজিদ করতে চাইলেও তার অনুমতি আছে। তবে পুরাতন মসজিদকে কোনো অবস্থাতে বাদ দিয়ে বা বন্ধ করে নয়। বরং পূর্বের ন্যায় তাতে নামায ও জমা'আত চালু রেখে প্রয়োজনে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে আপত্তি নেই। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫৮, আলবাহরুর রায়েক ৫/৪২১, আলফাতাওয়া আল হিন্দিয়া ২/৪২৮)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহাম্মদ নোমান

বাহাদুরপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামের এক প্রান্তে অনেক দিনের পুরাতন গ্রামের একমাত্র মসজিদটি অবস্থিত ছিল। কালের আবর্তনে এক সময় তা নতুন করে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই সর্বসম্মতিক্রমে নতুন করে নির্মাণের নিমিত্তে পুরাতন মসজিদ ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। এমতাবস্থায় গ্রামের কিছু মুসল্লী মসজিদের কিছু জায়গা ওয়াকফিয়া হওয়া না হওয়া ও মসজিদের পরিবেশ বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়ায় তারা আলাদাভাবে নামায আদায়ের নিমিত্তে নতুন মসজিদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেয় এবং মসজিদের জন্য গ্রামের মধ্যখানে পুরাতন মসজিদ হতে আনুমানিক ২০০-৩০০ গজ দূরত্বে সহীহ ওয়াকফের মাধ্যমে জায়গা প্রদান করত একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করে ৩-৪ বছর যাবৎ নামায আদায় করে আসছে। পুরাতন মসজিদটিও যথাযথ নির্মাণ হয়। বর্তমানে উভয় মসজিদের সার্বিক কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু কতিপয় সাধারণ লোক উক্ত নতুন মসজিদ মসজিদ নয় এবং তথা জুমু'আসহ কোনো প্রকার নামায, দান সদকা ইত্যাদি জায়েয নেই বলে দাবি করছেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো, বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নবনির্মিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ কি না? এবং তথায় জুমু'আসহ সকল প্রকার নামায আদায়, সদকা, বৈধ কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

বর্তমান লোক সংখ্যার তুলনায় মসজিদের সংখ্যা নগণ্য। যে হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মসজিদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার মতো নয়। সুতরাং যে কোনো প্রেক্ষাপটেই হোক না কেন, সহীহ ওয়াকফকৃত জমিনে মসজিদ নির্মাণ করা হলে তা শরয়ী মসজিদ বলে পরিগণিত হবে বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত নবনির্মিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচ্য। সেখানে জুমু'আসহ অন্য সকল নামায, দান, খয়রাত সবই সহীহ হবে। যাঁরা শরয়ী মসজিদ নয় বলে দাবি করেন তাদের কথা ভুল। তাদের জন্য বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের কাছে গিয়ে ভুল সংশোধন করে নেয়া উচিত। (আল বাহরুর রায়েক ৫/৪১৯, ফতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/২৯৭, ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৬/১৬৭)

প্রসঙ্গ : লটারির মাধ্যমে সঞ্চয় উত্তোলন

জহির রায়হান

গোপালপুর, টঙ্গী, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের অফিসে আমরা ১০-১২জন মিলে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করে থাকি। উক্ত টাকা জমা হওয়ার পর আমাদের ১২ জনের নাম আলাদা করে কাগজে লিখি। অতঃপর লটারিতে যার নাম উঠে সে টাকাগুলো নিয়ে নেয়। পরবর্তী মাসে তার নাম বাদ দিয়ে বাকি ১১ জনের নাম লটারিতে

দিই। এভাবে যার নাম উঠে তার নাম লটারিতে দেয়া হয় না। একে একে ১১ জনের নাম লটারিতে ওঠার পর ১২তম ব্যক্তি লটারি ছাড়াই তার জমাকৃত টাকা পেয়ে যায়।

উল্লেখ্য, প্রত্যেকে লটারিতে তাদের নাম উঠলেও তারা তাদের প্রতি মাসের নির্ধারিত টাকা জমা দিতে থাকে। উক্ত পদ্ধতিতে প্রত্যেকেই তার জমাকৃত টাকা লাভ ছাড়াই পেয়ে যায়। তবে একই সাথে বেশ কিছু টাকা পাওয়ার কারণে বিভিন্ন কাজে লাগানো যায়। এভাবে টাকা জমা দিয়ে লটারির মাধ্যমে টাকা নেয়াটাকে আমরা টান সমিতি বলে থাকি। শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত সমিতি করা ও তার টাকা নেওয়া বৈধ কি না? জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সুদমুক্ত ঋণ দেয়ার একটি সুন্দর পদ্ধতি। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তিকর বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে না বিধায় এমন "টান সমিতি" করা ও তা থেকে লটারির মাধ্যমে জমাকৃত টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/২৬২, ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/২৬৮, আ-পকে মাসায়েল আওর উন্‌কা হল ৬/২৬২ ও ২৭০)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মুহাম্মদ আনোয়ার হুসাইন

নাটোর।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদের ফান্ডের টাকা থেকে পরামর্শ ক্রমে জানাযার খাট বানানো জায়েয আছে কি না? যদি হয় তাহলে খাট রাখবে কোথায়?

সমাধান :

জানাযার খাট মসজিদের কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু নয় বিধায় মসজিদের ওয়াকফকৃত টাকা থেকে জানাযার খাট বানানো বৈধ নয় এবং জানাযার খাট মসজিদে না রেখে পরামর্শক্রমে অন্য কোথাও রাখবে। (ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৩১, ফতাওয়ায়ে সিরাজিয়া ৯১, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ২/১৬৩)

প্রসঙ্গ : তাবিজ কবজ

ইবনে শহিদ সিরাজী

আরামবাগ, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমরা জানি আয়াতে করিমা, দু'আ আদইয়া দ্বারা তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয। শরীয়ত এটার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো গাছের ছাল বা শিকড় দ্বারা তাবিজ ব্যবহারে শরীয়তে অনুমতি আছে কি না? জানতে চাই এবং তাবিজ ব্যবহার করা অবস্থায় কোনো কাজ বা কোনো স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ আছে কি না? জানালে উপকৃত হব।

সমাধান:

১। গাছের ছাল বা শিকড় ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করতে শরীয়তে কোনো আপত্তি নেই। তবে সর্বাবস্থায় প্রকৃত আরোগ্য দানকারী মহান আল্লাহ পাককেই মনে করতে হবে।

২। তাবিজ ব্যবহার করা অবস্থায় কোনো কাজ বা কোনো স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কুরআনের আয়াত দ্বারা লিখিত তাবিজ গিলাফবদ্ধ হলে তা নিয়ে টয়লেটে যাওয়া জায়েয হলেও তা বাহিরে রেখে যাওয়া উত্তম। আর গিলাফবদ্ধ না হলে তা নিয়ে টয়লেটে বা অপবিত্র স্থানে যাওয়া যাবে না। (রাদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৩, আদ্দুররুল মুখতার ১/১৭৮, আলফাতাওয়া আল হিন্দিয়া ৫/৪৩৫)

প্রসঙ্গ : পুরুষ কর্তৃক পর্দা ছাড়া নারীদের কুরআন শিক্ষা দেয়া

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (দুলাল)

নলসোন্দ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

জিজ্ঞাসা :

সম্প্রতি বাংলাদেশে "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা" নামে একটি সংস্থা চালু হয়েছে। তাদের হেড অফিস ঢাকাস্থ মিরপুরের কোনো এক এলাকায় অবস্থিত। এই সংস্থার পক্ষ থেকে সারা দেশের গ্রামগঞ্জে যেভাবে শিক্ষা দেয়ার কর্মশালা চালু হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত যা আমাদের গ্রামে ঘটছে তুলে ধরছি।

আমাদের গ্রামের যুবতী বালেগা বিবাহিতা নারী সকলে এসে এক বাড়িতে জমায়েত হয়। আর সেখানে উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে এক মৌলভীকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি এসে এই সকল মহিলাকে পর্দাহীনভাবে সরাসরি ও মুখোমুখি হয়ে তাদের পাঠদান নীতি অনুসারে পাঠদান করছেন। আমরা এভাবে পর্দাহীন হয়ে পড়ানো যাবে না বললে উক্ত মহিলাগণ বলে যে, আমরা তো অন্য সময়েও পর্দা করি না। এখন পর্দা করে কী হবে? আর উক্ত মৌলভী সাহেবও বলেন, আমি এদেরকে আমার মা-বোন মনে করে পড়াই। আমার মনে এদের প্রতি কোনো খারাপ ধারণা জাগ্রত হয় না।

অনুরূপ আরো একজন এলাকারই স্বল্প শিক্ষিত হুজুর সকালে মসজিদে বিবাহিতা, বালেগা মহিলাদেরকে পড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছে। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, এভাবে পর্দাহীন হয়ে বালেগা মহিলাদেরকে পড়ানো শরীয়তে জায়েয হচ্ছে কি না? এ ধরনের হুজুরের পেছনে নামায পড়া যাবে কি না? এলাকার লোকজন এদেরকে বাধা না দিলে তারা গোনাহগার হবে কি না?

সমাধান :

পর্দা করা শরীয়তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ বিধান। এই বিধানকে হীন মনে করা বা লঙ্ঘন করা মারাত্মক গোনাহের কাজ। সুতরাং মসজিদে বা কোনো বাড়িতে বেগানা পুরুষের জন্য পর্দাহীনভাবে বালেগা মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। বরং তা পরিহার করত তওবা করা অপরিহার্য।

যে মৌলবী সাহেব পর মহিলাদের মা-বোন মনে করে বেপর্দা হয় সে বড় পাপী। মনে খারাপ খেয়াল আসা ছাড়া বেপর্দা হওয়া এক গোনাহ। খারাপ খেয়াল আসা এর চেয়ে দ্বিগুণ মারাত্মক গোনাহ। আর যে সকল মহিলা তার কাছে পড়তে আছে তারা সর্বদা পর্দাহীনভাবে চলে বলে কুরআন শিক্ষার জন্য বেপর্দা হওয়ার অনুমতি দেয়া যায় না।

উল্লিখিত মাসআলা জানা সত্ত্বেও যদি কেউ এভাবে বালেগা মহিলাদেরকে পড়ানোর কাজ থেকে বিরত না থাকে তাহলে সে ফাসেক। আর ফাসেকের পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয বলে বিবেচ্য।

আর সমাজে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজকর্ম হতে দেখলে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে এলাকার মানুষ গোনাহগার হবে। (আবু দাউদ ১/১৬২, রাদ্দুল মুহতার ১/৪০৬, ১/৫৬০, বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৬৮)

প্রসঙ্গ : দ্বীনি কাজ করে বেতন নেওয়া

মুহাম্মদ এম, আলম

মুহাম্মদপুর, মুরাদপুর,

চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা : (১)

১. মসজিদ ও মাদরাসায় দরকারে নির্ধারিত বেতন, ভাতা ও থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে নেওয়া অর্থ (বেতন) জায়েয হবে কি না?

২. নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করতে গেলে উক্ত অর্থ নেওয়া জায়েয হবে কি না?

৩. সারা জীবন নামায, রোজাসহ সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালায় ওই সমস্ত দলের পক্ষে অবস্থান নিলে অর্থাৎ ভোট প্রদান করলে তাদেরকে ঈমানদার বলা হবে কি না?

৪. তাবিজ দোয়া ও ঝাঁড়ফুক দিয়ে মানুষের নিকট থেকে নির্ধারিত শর্তে টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

১. মসজিদ ও মাদরাসা থেকে শ্রম/কর্মের বিনিময়ে বেতন নেওয়া জায়েয আছে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৫৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৭৯)

২. নির্দিষ্ট ফিসের বিনিময়ে ওয়াজ করে টাকা নেওয়া জায়েয আছে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৫৫, ফতাওয়ায়ে রশীদিয়া ৫১৩)

৩. ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। এক. সাক্ষ্য, দুই. সুপারিশ, তিন. ওকালত। এই তিনটি দিক লক্ষ করে যেমনিভাবে একজন সৎ, যোগ্য ধর্মপরায়ণ, নেককার প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা বিরাট ছওয়াবের কাজ। ঠিক তেমনিভাবে অসৎ অযোগ্য , ধর্মহীন, ফাসেক এবং ইসলামবিরোধী দলের কোনো সদস্যকে ভোট প্রদান করা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, খারাপ কাজে সুপারিশ করা এবং অযোগ্যকে উকিল বানানো ইত্যাদি কারণে বড়ই গোনাহের কাজ। তাই এমন দল/ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি ভোট দিলে তাকে ঈমানহীন বলা না গেলেও প্রকৃত কামেল ঈমানদারও বলা যাবে না। (সূরায়ে নিসা আয়াত ৮৫, সূরা মায়েদা ৮, বুখারী শরীফ ৫৪, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/২৯৩)

৪. নির্ধারিত বিনিময়ের শর্তে তাবিজ দোয়া ও ঝাঁড়ফুক করে শ্রমের পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয আছে। (রাদ্দুল মুহতার ৬/৫৭, ফতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৫/৪৫)

প্রসঙ্গ : ক্বাজা নামায

মুহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম

বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কেউ কেউ বলেন যে, নামায ক্বাজা হয়ে গেলে বা জীবনে বহু নামায ক্বাজা হয়ে থাকলে খালেসভাবে তওবা করলে তা মাফ হয়ে যায়। আর ক্বাজাগুলো আদায় করতে হয় না। এমন কথা শরীয়ত সমর্থিত কি না? নামাযের ক্বাজা আদায় করার ব্যাপারে শরয়ী দলিল জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমান বালেগ নর-নারীর ওপর ফরজ। কোনো কারণে ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করতে না পারলে তা পরে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে। শুধুমাত্র তওবা করা যথেষ্ট নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উক্তি শরীয়ত সমর্থিত নয়। (বুখারী ১/৮৪, আলবাহরুর রায়েক্ব ২/১৪০, রাদ্দুল মুহতার ২/৬২)

প্রসঙ্গ : নামায

আব্দুল কাদের ইউসুফী

খোকসা কওমী মাদরাসা জানিপুর,

খাকসা, কুষ্টিয়া।

জিজ্ঞাসা :

ইমাম যদি মসজিদের মেহরাবে না দাঁড়িয়ে দু-এক কাতার পেছনে দাঁড়ান,

মুসল্লী কম, জায়গারও সমস্যা নেই তাহলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

সমাধান :

বিহিত কারণ ছাড়া ইমামের জন্য মেহরাব থেকে দু-এক কাতার বাদ দিয়ে দাঁড়ানো ঠিক নয়। তবে এর দ্বারা নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। (রাদ্দুল মুহতার ১/৫৬৮, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৩/৩৬০, ফতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৭/৯৮)

প্রসঙ্গ : ইমামতি

বদিউর রহমান

ইসলামিক সেন্টার, বারিধারা

ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

শরয়ী পর্দাহীন শালীন পোশাক পরা নারী এবং পুরুষ যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই মজলিসে উপস্থিত থাকেন এবং সে মজলিসে উপস্থিত হয়ে কোনো ইমাম যদি কোনো বয়ান বা দু'আ করেন এবং পরবর্তীতে তওবা ও এস্তেগফার করেন তাহলে এরূপ ইমামের পেছনে নামায পড়া দোষণীয় হবে কি না? এবং এরূপ ইমাম কি ইমামতির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবেন?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি আপন কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে খালেসভাবে তওবা করে নেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেন তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়া দোষণীয় হবে না। বরং তওবা করার কারণে তাঁকে নির্দোষ মনে করা হবে। এবং ইমামতির পদে তাঁকে বহাল রাখা যাবে। (সূরা আলে ইমরান ১৩৫, ইবনে মাজাহ ৪/৪৯১, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৪/৩৭, ফতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৩/১৪২)

প্রসঙ্গ : আযানের পূর্বে বড় আওয়াজে সালাত ও সালাম

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম তালুকদার

এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

ক. আমাদের দেশে বিভিন্ন মসজিদে আযানের পূর্বে–

الصلوة والسلام عليك يارسول الله
الصلوة والسلام عليك يانور الله
الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

পাঠ করে থাকে। এগুলো পাঠ করা শরীয়তসম্মত কি না?

খ. কিছু কিছু মসজিদে মুয়াযযিনেরা আযানের দু'আতে

ات محمدا ن الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة এর পর এমনিভাবে

وابعثه مقاما محمودا ن الذى وعدته

এরপর وارزقنا شفاعته يوم القيامة বৃদ্ধি করে। এগুলো দু'আতে বৃদ্ধি করা হাদীসে আছে কি না?

সমাধান :

ক. আযান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিখানো একটি ইবাদত ও ধর্মীয় নিদর্শন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষাতে আযানের পূর্বে সালাত ও সালামের কোনো প্রমাণ নেই। কোনো সাহাবী, ইমামগণ থেকেও এর পক্ষে কোনো আমল বা উক্তি নেই। এমতাবস্থায় ভিত্তিহীনভাবে আযানে সংযোজন করা একটি গর্হিত ও বর্জনীয় কাজ। (খায়রুল ফাতাওয়া ২/২২৯)

খ. আযানের পরে পড়ার দু'আ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিখানো। তাঁর শিখানো দু'আতে প্রশ্নে বর্ণিত দুটি বাক্য নেই। তাই এ দুই বাক্য যোগ করা ঠিক হবে না। (বুখারী ১/৮৬, আসসুনানুল কুবরা ১/৪১০, এ'লাউস সুনান ২/১১০)

প্রসঙ্গ : মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

মুহাম্মদ রমজান আলী

দৌলতপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

১. আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক মানুষ মাঝে মাঝে বড় বড় পীরদের মাযার যিয়ারতের নিয়্যাতে সফর করে থাকে। অথচ হাদীস শরীফে আছে–

لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد

এখন আমার প্রশ্ন হলো এই ভাবে সফর করা জায়েয কি না?

সমাধান :

কবর যিয়ারত করার প্রতি হাদীস শরীফে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাই শিরিক ও বিদ'আত থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থেকে আওলিয়ায়ে কেরামের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ। আর প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস শরীফটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কীয়। অর্থাৎ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ওই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদকে লক্ষ্য করে সফর করা নিষেধ। মসজিদের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য ব্যাপারে সফর করার সাথে এর সম্পর্ক নেই। (মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৫৪, জামেউত তিরমিযী ১/২০৩, রাদ্দুল মুহতার ২/২৪২, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী ২২০, আলবাহরুর রায়েক ২/১৯৫, ফতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/১৫৬, আ-পকে মাসায়েল আওর উন্‌কা হল ৩/১৭০)

প্রসঙ্গ : হায়াতুন নবী

জিজ্ঞাসা :

২. কিছু কিছু লোক বলে থাকেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরে মৃত। কারণ আল্লাহ তা'আলা

বলেন انك ميـــت وانهـــم ميتـون অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো الانبيـاء احيـاء فى قبورهـم এখন জানতে চাই যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরে জীবিত না কি মৃত?

সমাধান :

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাদের কবরের হায়াত এবং দুনিয়াবী হায়াত ভিন্ন। (সূরাতুল বাকারা আয়াত ১৫৪, মিশকাতুল মাসাবীহ ৮৭, মুসলিম শরীফ ২/২৬৭, উমদাতুল ক্বারী ৪/৪৮, রাদ্দুল মুহতার ৪/১৫১,)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক

আলোকদিয়া, রশিদাবাদ

সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব জমিনের নির্দিষ্ট একটি অংশ মসজিদের নামে মৌখিক ওয়াকফ ঘোষণা করে তার ওপর একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এই মসজিদে জুমু'আর নামাযসহ সকল প্রকার নামায এবং ইবাদত করা যাবে কি না? এবং মসজিদটি শরয়ী (শরীয়াসম্মত) মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না? উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে লিখিত আকারে ওয়াকফ নামা সম্পাদন করবেন। এমতাবস্থায় লিখিত ওয়াকফ নামা সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত মৌখিক ওয়াকফকৃত মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামায, জুমু'আর নামায ও তারাবীহর নামায আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়া মতে কোনো বাধা-নিষেধ আছে কি না? জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য লিখিত বা রেজিস্ট্রারি হওয়া জরুরি নয়। বরং মৌখিকভাবে ওয়াকফ করলেও তা শুদ্ধ হয়ে যায়। বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে ওয়াকফকারীর মৌখিকভাবে ওয়াকফ করা সহীহ হয়েছে এবং তাতে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। উক্ত মসজিদে জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং মসজিদভিত্তিক সব ধরনের কর্মকাণ্ড জায়েয বিবেচিত হবে। (আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৫৬, রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫৬, ফাতাওয়া মুফতী মাহমুদ ১/৭৪৪)

লেখা আহ্বান **লেখা আহ্বান** **লেখা আহ্বান**

আল-আবরার পরিবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে আহ্বান জানাচ্ছে, সমাজের বিজ্ঞ, দক্ষ, সহনশীল ও মননশীল ইসলামিক স্কলার, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের মূল্যবান তাত্ত্বিক লেখনী ও কবিতার, যা পূরণ করবে সমাজের ইসলামপ্রিয় সর্বসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা ও মেটাবে তাদের পিপাসা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

১। লেখককে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।
২। লেখকের পূর্ণ ঠিকানা পেশ করতে হবে।
৩। লেখা বিষয়ভিত্তিক, যুগোপযোগী, গবেষণালব্ধ ও তথ্যবহুল হতে হবে।
৪। কোনো সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও বিতর্কিত লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। প্রতিটি বিষয়ের রেফারেন্স সবিস্তারে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬। লেখা এ-৪ সাইজের কাগজে এক পিঠে কম্পোজ করে অথবা সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে।
৭। সম্পাদনা দফতর লেখা নির্বাচন, কাটছাঁট করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার রাখবে।
৮। অনির্বাচিত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
৯। লেখা প্রতি ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা দফতরে পৌঁছাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রকাশনা দফতর : মাসিক আল-আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ,
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বাড্ডা, ঢাকা।
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম ইমদাদিয়া, আগ্রা, ইন্ডিয়ার অন্যতম মুহাদ্দিস ও মুফতী বিশিষ্ট মুনাযির আল্লামা সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব সাহেব–

শরয়ী বিধান পরিপালনে ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনিবার্যতা-৩

এটিই দ্বীন। সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই করেছিলেন। আমি পূর্বেই বলেছি সাহাবায়ে কেরাম নামায নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তিনভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন। কিছু বিষয় শ্রুত, কিছু অংশ দৃষ্ট, আর কিছু বিষয় ছিল যেগুলো জিজ্ঞেস করে বুঝে নিয়েছেন। সেরূপ দ্বীনের সকল বিষয়েই সাহাবায়ে কেরাম এই তিনভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন। কিছু শুনেছেন, কিছু দেখেছেন কিছু জিজ্ঞেস করে বুঝে নিয়েছেন। কেউ যদি চায় ফিক্‌হ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু হাদীস শরীফের ওপরই আমল করবে তবে পুরোপুরি দ্বীনের ওপর আমল করা সম্ভব হবে না।

আমি পূর্বেও এই হাদীস পাঠ করেছি।

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب

গাইরে মুকাল্লিদগণ এই হাদীস খুব বেশি বেশি উপস্থাপন করে থাকেন। "যে সূরা ফাতেহা পাঠ করেনি ইমামের পেছনে তাঁর নামায হয়নি।"

আমরা তো তালেবে ইলম। এরূপ কোনো মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় সামনে এলে আমাদের উচিত সে ব্যাপারে সকল প্রকার প্রমাণাদি জেনে নেয়া। কারণ বাতিলদের একটা অভ্যাস হলো তাঁরা বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, ভুলকে শুদ্ধ বলে চালিয়ে দেয় এবং প্রতারণার পথ বেছে নেয়।

উক্ত বিষয়ে প্রমাণাদি দেখুন। এটি বুখারী শরীফে আছে, হযরত উবাদা ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত হাদীস

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب

"যে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করল না তার নামায হয়নি।"

সামান্য চিন্তা করুন, এখানে মুক্তাদির কথা উল্লেখ নেই। এই রেওয়ায়াতটি অপরিপূর্ণভাবেই বুখারী শরীফে রয়েছে। মুসলিম শরীফে হাদীসটি একই শিরোনামে, একই বর্ণনাকারী সূত্রে পুরোপুরি আছে।

لاصلوة الا بفاتحة الكتاب ومازاد وما تيسر

মুসলিম শরীফের এই হাদীসে–

لاصلاة الا بفاتحة الكتاب এর সাথে وما زاد وما تيسر সংযুক্ত আছে। সেরূপ দেখুন মুসান্নাফে ইবনে শায়বায় হাদীসটি তিনজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। প্রত্যেকটিতে مازاد وما تيسر অতিরিক্ত আছে। আপনারা হয়ত বুঝে গেছেন مازاد وما تيسر বলে কোন পার্থক্যটা সেখানে করা হচ্ছে। তা হলো এখানে মুক্তাদি ও মুনফারিদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই হাদীসটি মুনফারিদ বা একা নামায আদায়কারীর ব্যাপারে বর্ণিত। মুক্তাদির সাথে এই হাদীস শরীফের সম্পর্ক নেই। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদে আহমাদের শুরুতেই। সেখানেও আছে–

ومازاد وماتيسر اية فصاعدا آيتين فصاعدا ومازاد وما تيسر

অর্থাৎ এমন শব্দ বর্ণিত আছে, যার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই হাদীস শরীফ মুনফারিদ এবং ইমামের জন্য। মুক্তাদির জন্য নয়।

দেখুন! মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবাদীতে পূর্ণ হাদীস আছে। যেখানে এমন শব্দ সংযুক্ত আছে যা থেকে বোঝা যায় হাদীসটি মুক্তাদির জন্য নয়। বুখারী শরীফে হাদীসটি অর্ধেক আছে। সেখানেও মুক্তাদির কোনো কথা উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও সে হাদীস থেকে এই ব্যাখ্যা কোথায় পেলেন যে, "ইমামের পেছনে মুক্তাদির সূরায়ে ফাতিহা পড়া জরুরি?"

বন্ধুগণ! এটি হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা নয়। এটি হাদীসের সঠিক ফেকাহ হতে পারে না।

চার ইমামের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ফতওয়া হলো ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা জরুরি নয়। তাঁর প্রমাণসমূহে একটি দলিল তো আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করছিলাম।

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب

বুখারী শরীফের বর্ণিত হাদীসটি একদিকে অপরিপূর্ণ অন্য দিকে সেখানেও মুক্তাদির কোনো উল্লেখ নেই। অথচ একই রেওয়ায়াত অন্য কিতাবে পরিপূর্ণভাবে আছে। সে বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায়, হাদীসটি মুনফারিদ এবং ইমামের জন্য খাস।

উলামায়ে কেরাম হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর ফতওয়ার পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ দিতে গিয়ে এও বলেন থাকেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মে'রাজের সময় মসজিদে আকসায় সকল নবী রসূল-এর ইমামতি করেছিলেন।

সূরায়ে ফাতেহার শানেনুযূলে আপনারা পড়েছেন হয়তো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, "এটি (সূরায়ে ফাতেহা) কেমন সূরা! যা তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবূর কোনো কিতাবে নাযিল হয়নি। পবিত্র কুরআন মজীদে এক আয়াতে আছে, "আমি তোমাকে سبع مثانى দান করেছি।" তা থেকে উদ্দেশ্য সূরায়ে ফাতেহা। আরেক হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট বলেছেন, এই সূরা (সূরায়ে ফাতেহা) আল্লাহ পাক কোনো নবীকে দেননি।

এখন আমি প্রশ্ন করি, হযরত আদম

(আ.) থেকে আরম্ভ করে সকল নবী রসূল ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুক্তাদি হয়ে মসজিদে আকসার মধ্যে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলছেন, সূরায়ে ফাতেহা কোনো নবী রসূলের ওহীর অংশ নয়। অর্থাৎ কোনো নবী রসূল সূরায়ে ফাতেহা জানতেন না। তাহলে বোঝা যায় ইমামুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা ছাড়া সকল নবীদের নামায পূর্ণই হয়েছে। যদি মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতেহা পড়া এতই জরুরি হতো তবে মে'রাজের রাতে নবীদের নিয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপরিপূর্ণ নামায পড়াতেন না।

সুতরাং যারা বলে সূরা ফাতেহা না পড়লে মুক্তাদির নামায অপরিপূর্ণ হয়ে যায়, আসলে তাদের বোধই নাকেস-অপরিপূর্ণ। হাদীস শরীফ থেকে কোনোভাবেই এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে না মুক্তাদির জন্য সূরায়ে ফাতেহা পড়া জরুরি।

আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর ইমামতিতে প্রায় সতের ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। এই নামাযের ব্যাপারে হাদীসে সব কিছুরই বর্ণনা আছে কিন্তু নবী (সা.) যে, মুক্তাদি হিসেবে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করেছেন এরূপ কোনো কথা উক্ত হাদীসে নেই। আরেকটি রেওয়ায়াতে আছে, একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরের প্রাক্কালে জরুরত পূরণে সামান্য বিলম্ব হওয়ার কারণে জনৈক সাহাবী নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পেছনে মুক্তাদী হিসেবে নামায আদায় করলেন। পেছন থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লক্ষ্য করলেন যে, তাড়াহুড়ার কারণে অনেকের পায়ের গোড়ালিতে পানি পৌছেনি। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

ويل للاعقاب

এ ক্ষেত্রেও ইমামুল আম্বিয়া মুকতাদী এবং একজন সাহাবী ইমাম। সব কিছু বর্ণিত আছে– নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের গোড়ালি সম্পর্কে বারণ করার বিষয়ও উল্লেখ আছে কিন্তু সূরায়ে ফাতেহা সম্পর্কিত কোনো কথা উল্লেখ নেই। এ পর্যন্ত আমি সাধারণ কিছু পর্যালোচনা করলাম।

বন্ধুগণ! গাইরে মুকাল্লিদদের যতসব প্র প্রতীকী বিষয় বা মাসআলা আছে সেগুলোর ওপর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হলে দেখা যাবে তাদের কোনো মাসআলার দলিল নেই। বরং তারা নিজেদের বুঝকেই সব কিছুর ওপরে স্থান দিয়ে থাকে। এমনকি তাদের বুঝকে সাহাবায়ে কেরামের বুঝের ওপরও স্থান দিয়ে থাকে এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথেও তারা বৈরিতা ও জেদ করে থাকে। ইমামের পেছনে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা, উচ্চস্বরে আমীন বলা, রফয়ে ইয়াদাইন বা হাত তোলা ইত্যাদি যে মাসআলাই হোক না কেন।

একদা আহলে হাদীসের লোকদের সাথে কথা হচ্ছিল। তাঁরা বললেন, রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে এত হাদীস, আমরা বললাম রফয়ে ইয়াদাইন না করার পক্ষে এতগুলো হাদীস। তাতে হাদীসের বর্ণনায় বিভিন্ন মত দেখা গেল। রফয়ে ইয়াদাইন করার পক্ষেও বর্ণনা আছে না করার পক্ষেও বর্ণনা আছে।

সাধারণ বিবেকে যদি দেখা যায় সহীহ রেওয়ায়াত কোনোটি আর কোনোটি সহীহ নয়? তখন এ কথা বলতে হবে যে, কোনো বিষয় ফরজ, কোনো বিষয় ওয়াজিব বা সুন্নাত বা মুস্তাহাব এসব ফুকাহায়ে কেরামের ইজতিহাদ। সেরূপ কোনো হাদীসটি সহীহ কোনোটি সহীহ নয় বা জয়ীফ তা মুহাদ্দিসীনে কেরামের ইজতিহাদ। যদি ফুকাহায়ে কেরামের ইজতিহাদের তাকলীদ শিরিক হয় তবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের ইজতিহাদের তাকলীদও শিরিক হওয়া আবশ্যক। কারণ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না কোনো হাদীসকে সহীহ বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন না জয়ীফ বলেছেন।

হাদীসের দুটি অংশ আছে। একটি "সনদ" বর্ণনাকারীর পরম্পরা। আরেকটি হলো "মতন" বা হাদীসের শব্দ ও পাঠ। হাদীসের সনদ যাচাইয়ের একটি মাপকাঠি আছে সেরূপ হাদীসের মতন যাচাই করারও একটি মাপকাঠী আছে। কোনো হাদীসের সনদ সহীহ হবে তাই এর মতনও সহীহ হতে হবে তা আবশ্যক নয়। আবার কোনো হাদীসের মতন সহীহ হলে তার সনদও সহীহ হতে হবে তাও আবশ্যক নয়। এ বিষয়ে আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স মোবারকের ব্যাপারে মুসলিম শরীফে তিন প্রকারের বর্ণনা আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হলেন এর বর্ণনাকারী। হাদীসগুলোর সনদ মুসলিম শরীফের মাপকাঠি মতে খুবই উঁচুমানের এবং অত্যন্ত সহীহ। কিন্তু কথা তিন প্রকার এবং সাংঘর্ষিক। এক হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উমর শরীফ ৬০ বছর। আরেক বর্ণনায় আছে ৬৩ বছর আরেক বর্ণনায় আছে ৬৫ বছর। তিন হাদীসেরই সনদত খুবই সহীহ এবং উঁচুমানের। কিন্তু তিন প্রকারের মতনের মধ্যে একটি সহীহ হতে হবে। আমাদের উলামায়েকেরাম বলে থাকেন মতন সহিহ হওয়ার মাপকাঠি হলো সুন্নাহ। সাহাবায়ে কেরামের আমল। আর সনদের জন্য মাপকাঠি মুহাদ্দিসগণ ইজতিহাদ করে নিজেরাই তৈরি করেছেন। মুহাদ্দিসগণ একটি বিধান তৈরি করেছেন যে, বর্ণনাকারীর মধ্যে অমুক দুর্বলতা

বিদ্যমান থাকলে তার বর্ণনা জয়ীফ বলে বিবেচিত হবে। এসবের মাপকাঠিতো স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কায়েম করেননি। বরং মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন মুহাদ্দিসগণ। আমি জিজ্ঞেস করি ফক্বীহ ইমাম ও মুজতাহিদগণ কর্তৃক কুরআন থেকে বিভিন্ন বিধান সংকলন করে আবিষ্কৃত উসূলে ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতির তাকলীদ করলে শিরক হয়ে যায়, মুহাদ্দিসগণ কুরআন থেকে সংকলন করে اصول الجرح والتعديل "বর্ণনাকারীর দোষ গুণ বিবেচক নীতি" তৈরি করলে সেটার তাকলীদ করা প্রকৃত ঈমান হয়ে যায় এটা কোন ধরনের কথা? যদি তাকলীদ করা শিরিকই হবে তবে মুহাদ্দিসগণের তাকলীদ করাও শিরক হতে হবে। মুহাদ্দিসগণ একটি নীতিমালা দিয়েছেন যে, মিথ্যুকের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। সেরূপ নীতিমালা তৈরি করেছেন যে, যে লোক ভুলে যায় বা স্মরণ শক্তিকম তার বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের সে নীতিমালার ওপর সৃষ্ট বিধানকে বলা হয় اصول الجرح والتعديل তাঁদের নীতিমালার সব কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে আবার ফকীহদের ফিকহের নীতিমালা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং শিরক হবে এটি কোন ধরনের বিচার?

আমি বলতে ছিলাম রফয়ে ইয়াদাইন করার পক্ষে এতগুলো হাদীস আবার না করার পক্ষে এতগুলো হাদীস। এখন তারা বলেন, সহীহ হাদীস কোনটি দেখলে ভাল হবে। বন্ধুগণ কোনো হাদীস যদি সনদ হিসেবে সহীহও হয় কিন্তু যদি সে হাদীস মতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আমল প্রচলিত না থাকে তবে সেটা যদি نص قطعى অথবা نص قطعى যেভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন সেভাবে স্বীকৃত না হয় তবে আমলযোগ্য নয়। রফয়ে ইয়াদাইন করা আর না করার মধ্যে কোনটা সঠিক তা কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ দিয়ে যাচাই করা যায়। পবিত্র কুরআনে আছে–

قوموا لله قانتين
اقم الصلوة لذكرى

যখন হাদীসের বিভেদ দেখা দেবে তখন তা ফায়সালা করবে পবিত্র কুরআন। কুরআনে বলা হচ্ছে –

اقم الصلوة لذكرى "নামায কায়েম করো আমার যিকিরের মাধ্যমে।" বন্ধুগণ গভীর চিন্তা করলে দেখা যায় নামাযের এমন কোনো অংশ নেই যেখানে যিকির, তেলাওয়াত বা তাসবীহ নেই। নামাযের প্রত্যেকটি অংশে যিকির সংশ্লিষ্ট আছে। আল্লাহু আকবর বলে নামায আরম্ভ করা হয়। এর পরই ছানা পড়া, তারপর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করা, এরপর ফাতেহা পড়া, তারপর সূরা পাঠ, আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাওয়া, রুকুর তাসবীহ, উঠার সময় তাসবীহ, রুকু থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর দু'আ, এর পর সিজদা। এমনিভাবে সালাম পর্যন্ত এমন কোনো অংশ নেই যেখানে কোনো না কোনো তাসবীহ বা পড়ার কোনো বাক্য নেই। কোথাও খামুশ থাকার ব্যবস্থা নেই। তাহলে বোঝা যায় اقم الصلوة لذكرى এর চাহিদাই হলো নামাযের প্রতিটি অংশের সাথে কোনো না কোনো যিকির বিদ্যমান থাকা। আবার قوموا لله قانتين তোমরা আল্লাহর সামনে অত্যন্ত খুশু খুজুর সাথে দাঁড়িয়ে থাকো।

এখন চিন্তা করলে দেখা যাবে, গাইরে মুকাল্লিদদের রফয়ে ইয়াদাইনে খুশু-খুজু নেই। তাদের রফয়ে ইয়াদাইনের আমলের সাথে কোনো তাসবীহ বা যিকিরও নেই। আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই! আমাদের রফয়ে ইয়াদাইনে আল্লাহু আকবর আছে, আমাদের রুকুতে যাওয়ার জন্য আল্লাহু আকবার আছে, রুকু থেকে ওঠার জন্য সামিআল্লাহু লিমান হামিদা আছে, কিন্তু আপনারা যে নামাযের মধ্যে হাত উঠান সে রফয়ে ইয়াদাইনের জন্য কোনো যিকির আছে? আজ পর্যন্ত গাইরে মুকাল্লিদদের কেউ তাদের রফয়ে ইয়াদাইনের জন্য কোনো যিকির বা কোনো তাসবীহ আছে তার উত্তর দিতে সক্ষম হননি।

আমরা যে রফয়ে ইয়াদাইন করি পুরো উম্মত করে থাকে। তা সুন্নাতে মুআক্কাদা, এমনকি তা শে'আরের মর্যাদাপ্রাপ্ত। অনেক লোক মনে করে আমরা রফয়ে ইয়াদাইন করি না। আমরা তো নামায আরম্ভই করি রফয়ে ইয়াদাইনের মাধ্যমে। কিন্তু ওই রফয়ে ইয়াদাইন যেখানে কোনো তাসবীহ নেই। তা বিবর্জিত। নামাযে সেটা বর্জন করা হয়েছে।

বন্ধুগণ! এরূপ কোনো মাসআলায় তাদের কাছে কোনো দলীল নেই। তারা ধোঁকা খুবই দেয়। আমাদের উচিত হলো বিষয়গুলো আমরা ভালো করে জেনে নেয়া এবং বুঝে নেয়া।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

ভাষান্তর : জমীরাবাদী

(২২ পৃষ্ঠার পর)

যদি ইলমের ক্ষেত্রে সনদের বিষয়টি না থাকত, তাহলে অবশ্যই মানুষ যা চাইত (দ্বীনের বিষয়ে) তা-ই বলে ফেলত। বর্তমানে হচ্ছেও তাই। মানুষ বাজার থেকে ইসলামী বই কিনে এনে নিজের ইচ্ছামতো ইসলামের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুক। ইলম ও জ্ঞানকে গুলিয়ে না ফেলে সত্যিকারের ইলম অর্জনের তাওফীক দান করুক আমীন।

লেখক : মুহাদ্দিস, কারবালা মাদরাসা, বগুড়া।
kf.karim@yahoo.com

প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি

ইখলাস-নিষ্ঠা, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, উচ্চ সাহসিকতা, আদাব ও শিষ্টাচার

মূল : মাওলানা হুযায়ফা দস্তানভী

অনুবাদ : সলিমুদ্দীন মাহদি

আল্লাহ তা'আলার সেফাত ও বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে একটি হলো, ইলম। আল্লাহর সত্তা চিরস্থায়ী, তাই তার সিফাতগুলোও চিরস্থায়ী। তার কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে দান করেছেন। এবং তা দ্বারা মানবজাতিকে উৎকৃষ্ট করেছেন। বরং কারো কারো মতে এই ইলম মানবজাতিরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য, তা 'ইনসানের ফিতরত' মানব প্রকৃতির মধ্যে আমানত রাখা হয়েছে, এবং তা দ্বারা অন্য জাতি থেকে পার্থক্য সাধিত হয়।

মানবজাতিকে এই 'ইলম' দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্য হলো উত্তম চরিত্র, উন্নত বৈশিষ্ট্য, উৎকৃষ্ট আদর্শ সৃষ্টি করা। আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে সকল উত্তম বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হয়েছে। তাই তার ইলম হলো 'ইলমে মুহীত্ব'-ব্যাপক ইলম। আল্লাহ তা'আলা এই সিফাতের বৈশিষ্ট্য মানবজাতির মধ্যে এজন্য রেখেছেন, যেন তারা تخلقوا باخلاق الله 'আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও' হাদীসের ওপর আমল করতে পারে। এবং বান্দা নিজের মধ্যেও পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। হযরত আদম (আ.)-কে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণ দান করা হয়েছে তার কারণও একমাত্র 'ইলম'ই। সুতরাং ইলমের প্রাপ্য হলো, যত ইলম বেশি হবে মানুষ তত বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা 'ইলমে ওহী' দান করেছেন। তারা সকল মানুষের জন্য আদর্শ।

সাহাবায়ে কেরামগণও ইলমে ইলাহী ও ইলমে নববীর অন্বেষণে মত্ত ছিলেন; তাই তাদের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাঁরাও আগামী প্রজন্মের জন্য আদর্শ।

অতএব বোঝা যায়, ইলমে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক 'আহলে ইলম' ওলামায়ে কিরামগণকেও করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে দেখা যায়। আমরা এই দুর্দশার কারণ ও উপকরণ সমূহ নির্ণয় করার প্রয়াস পাব।

শিক্ষার বর্তমান এই করুণ পরিস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট কোনো এক শ্রেণীকে দায়ী করা যায় না। বরং গোটা উম্মত; একাকি বা সামগ্রিকভাবে সকল শ্রেণীর মুসলমানকে এর দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অধিক যিম্মাদারী তোলাবা-ছাত্রদেরকে নিতে হবে। তাই আমরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সামান্য আলোচনা করছি।

১. ইখলাস-নিষ্ঠা :

সর্বপ্রথম কয়েকটি প্রশ্ন– এক. ইলমী অধঃপতনের কারণ কী? দুই. ছাত্ররা কেন মেহনত করে না? তিন. ইলম অনুপাতে জীবন কেন গড়ে না? চার. ওলামা-তোলাবারা কেন আখেরাতের ফিকির এবং উম্মতের দুঃখে দুঃখিত হয় না? এ সকল প্রশ্নের উত্তর নিমিষেই দেওয়া কি সম্ভব? আসুন আমরা আজ তার সামান্য আলোচনা করব।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই পৃথিবী 'দারুল আসবাব' তথা মাধ্যম দ্বারা অর্জিত হয়। এবং আল্লাহ তা'আলা 'মুসাব্বিবুল আসবাব' সকল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। তাই 'কিয়ামত সন্নিকটে, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, মেহনতে কোনো উপকার হবে না' এ ধরণের কথা আমাদের অন্তর থেকে মুছে দিতে হবে। উপায়-উপকরণের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ দেয়া জরুরি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

ان الله لا يضيع اجر المحسنين

"আল্লাহ তা'আলা নিষ্ঠার সাথে মেহনতকারীদের মেহনত বিনষ্ট করেন না।"

এখন আপনি একটু চিন্তা করুন, 'মুহসিনিন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'মুজতাহিদীন' বা 'আমেলীন' বলেননি। অথবা 'মুখায়য়ারীন' 'সা'য়ীন' বা 'শাগিলীন' শব্দও প্রয়োগ করেননি। তার কারণ হলো, এই শব্দগুলোর মধ্য থেকে 'ইহসান' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ ও সর্বমর্মী। কেননা, ইহসানের শাব্দিক অর্থ খুব ভালো করা, আর খুব ভালো করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কাজকর্ম, ব্যস্ততা ও কোশিশের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় 'ইহসান' বলা হয়, ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্য কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়া। অতএব, মুহসিনিন মানে, খুব প্রচেষ্টার সাথে একান্ত মেহনত করে কেবলমাত্র আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে কাজ সম্পাদনকারী।

আমরা নিজেদের শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের উপর একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, বাস্তবে কী আমরা 'মুহসিনিন'-এর অন্তর্ভুক্ত? আমরা কি মেহনত ও প্রচেষ্টা, কোশিশ ও একাগ্রতার মধ্যে লেগে আছি? আমাদের মধ্যে কি ইখলাছ ও নিষ্ঠা কাজ করছে? এসব প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরই মিলবে। অধিকাংশ ছাত্রদের নিকট মেহনত ও একাগ্রতার অনুভূতিই নেই। যাদের যৎসামান্যও আছে তারা এই মেহনতের সাথে আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য; নিষ্ঠা, বিনয়, শিষ্টাচার, উত্তম চরিত্র, গোনাহ থেকে

বেঁচে থাকা ইত্যাদি থেকে বহুদূরে অবস্থান করে।

তাই, প্রিয় ছাত্রদের নিকট মিনতির সাথে আরজ করছি, আল্লাহর ওয়াস্তে অলসতা ও অবহেলা ছেড়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে মেহনত করে ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করো। যেন দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হও। সাথে সাথে অহংকার, হিংসা, মিথ্যা কথা এবং মন্দ চরিত্র ও বেয়াদবী (কিতাবের সাথে হোক বা শিক্ষকের সাথে, দরসেগাহের সাথে হোক বা প্রতিষ্ঠানের সাথে) থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

সারকথা : সর্বপ্রথম করণীয় হলো, ইলম অন্বেষণে ইখলাছ বা নিষ্ঠা সৃষ্টি করার জন্য আমাদেরকে এই নিয়্যাতই করতে হবে, আমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করছি। انما الاعمال بالنيات সকল আমলের নির্ভরশীলতা হলো নিয়্যাতের ওপর।

তখন মেহনত-মোজাহাদার তাওফীকের রাস্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে খুলে যাবে। আমরা বছরের শুরুতেই এই নিয়্যাত করব যে, হে আল্লাহ আমাদের এখানে জমায়েত হওয়ার উদ্দেশ্য ইলম অর্জন করে তার ওপর আমল করা এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করা।

২. ধারাবাহিক মেহনত :

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা! আপনারা অবশ্যই সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পড়েছেন বা শুনেছেন। তাদের জন্য কোনো যিম্মাদার ও পরিদর্শক ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ছিল। তাই সদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করার তাওফীক প্রাপ্ত হতেন। আপনারা অবশ্যই 'আস্হাবে সুফ্ফা'র জীবনী পড়েছেন, তাঁর তো খাদ্য-বস্ত্র ছাড়াও মেহনতে লেগে থাকতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাঁদের মধ্যে একজন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিভাবে চমকালেন? তাবেয়ীনদের জীবনী অধ্যয়ন করুন, ওই যুগে না ছিল কোনো দরসেগাহ, না ছিল কোনো কামরা। আবাসিক হোস্টেলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পানাহারের জন্যও কোনো হোটেলের ইন্তিজাম ছিল না। এসবের ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে একাগ্রচিত্রে ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের এই সকল উৎসর্গের কারণে ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডার কিতাবের পৃষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তাঁরা যদি আমাদের মতো বিলাসী ও শান্তিপ্রিয় হতেন তাহলে অবশ্যই আজকের এই ইলমের ভাণ্ডার কখনো সংরক্ষিত হতো না। এই সকল ধর্মীয় কিতাবাদী ও দ্বীনি মাদারিস সমূহের অস্তিত্ব দেখা যেত না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ ধর্মীয় বিষয়ে যত লিখেছেন অন্য কোনো ধর্মে এর নজির নেই। যেমন, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) একটি পৃথক কিতাব লিখেছেন,

العلماء العذاب الذين آثروا العلم على الزواج

অর্থাৎ ওই সকল ওলামায়ে কিরাম যারা ইলমের জন্য বিবাহ-শাদি পরিত্যাগ করেছেন। যাদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কিরাম হলেন, ১. হান্নাদ ইবনে সারি কূফী মুহাদ্দিস ছিলেন। ২. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তবারী, মুফাস্সির ছিলেন। ৩. আবু বকর ইবনুল আনবারী, নাহুবিদ ও মুফাস্সির ছিলেন। ৪. আবু আলী আল-ফারেসী, উচ্চমানের নাহুবিদ ছিলেন। ৫. আবু বকর আন্দলুসী, মুহাদ্দিস ছিলেন। ৬. মাহমুদ ইবনে ওমর যমখশরী, মুফাসসির ছিলেন। ৭. মহিউদ্দীন যাকারিয়া আন-নববী, মুহাদ্দিস ছিলেন, এবং মুসলিম শরিফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারক এবং অসংখ্য কিতাবের লিখক। ৮. আবুল হাসান ইবনু নফ্স দামাশক্বী। ৯. ইবনে তাইমিয়া হারানী, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির এবং অসংখ্য কিতাবের লিখক। ১০. ইজদুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে জমা'য়া মিসরী, ফকীহ ও উসূলে ফিক্বহের ইমাম ছিলেন। ১১. মুহাম্মদ তোলোন, প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ছিলেন। ১২. সুলাইমান ইবনে আমরুল জমীল, জালালাইন শরিফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার। ১৩. আবুল মায়া'লী মাহমুদ শুকরী আলূসী, অনেক বড় সাহিত্যিক ছিলেন। ১৪. আবুল ওফা আল-আফগানী হিন্দি, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। এ ধরনের অগণিত মনীষী অতিবাহিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে এ সকল মনীষীদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাঁরা নিজেদের ধন-সম্পদ, সময় ও জীবন এবং চাওয়া-পাওয়া সব কিছু ইলমের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন। আজ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে এই সম্মান দান করেছেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, অথচ এখনো মুসলমানরা তাঁদের নাম সম্মানের সাথে স্মরণ করেন এবং 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' (আল্লাহ আপনার ওপর রহমত নাযিল করুন) বলে দু'আ করে।

আমাদের পূর্বাপর ওলামায়ে কিরাম এত কষ্ট ও প্রচেষ্টা এবং মেহনত-মোজাহাদা করেছেন যে, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর রচনা–

صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصيله-

এর ভূমিকায় লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, ''যদি আপনারা আমাদের ওলামায়ে কিরামগণের জীবন চরিত অনুসন্ধান করে অধ্যয়ন করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, তাঁরা কেমন ছিলেন? এবং নিজেদেরকে কিভাবে গঠন করেছেন? তাঁরা তো এমন মানুষ ছিলেন, যাঁরা কেবল মাত্র ইলমের জন্য দূরদূরান্তের সফরে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণার ওপর ধৈর্যধারণ করেছেন। রাতের বেলায় নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিজেদেরকে ভীষণ কষ্টে নিপতিত করেছেন। এমনকি ইতিহাস তাদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে অক্ষম। আমি, আমার লেখনীতে তাদের সকলের আলোচনা গ্রন্থিত করার ইচ্ছুক নই। বরং নমুনা স্বরূপ মুষ্টিমেয় কয়েক জনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করব। কেননা, তাঁদের কুরবানীর পরিমাণ এত বেশি যে, সবগুলো এখানে

বর্ণনা করা দুষ্কর। ইলমের জন্য ধৈর্যের এমন বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে, যা মানুষের অন্তর গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সকল ঘটনাবলি শতভাগ বিশুদ্ধ। কেননা, সনদের সাথে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী থেকে বর্ণিত। কিছু বিস্ময়কর কাহিনী আপনার সামনে পেশ করছি, যা আপনার বোধগম্য নাও হতে পারে। কিন্তু এত সহীহ ও সনদবিশিষ্ট বর্ণনা যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে বর্ণিত যে, আপনাকে বিশুদ্ধ মানতেই হবে। যেমন অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআছ আস্-সাজাসতানী (রহ.) আপন কিতাব সূনানে আবি দাউদের 'ক্ষেতের ছদকা' অধ্যায়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যে, আমি মিসরের সফরে একটি মুরগি দেখেছি যে, তার দৈর্ঘ্য তের হাত এবং একটি বিশেষ ফল দেখলাম যে, তা কেটে উটের ওপর এভাবে বিছিয়ে দিয়েছে যে, তার এক অংশ উটের কুঁজের ডান পার্শে এবং অপর অংশ উটের কুঁজের বাম পার্শে বেষ্টন করে আছে। কেউ কি তার সত্যায়ন করতে পারবে? কিন্তু এমন এক মুহাদ্দিস সাহেব তার বিবরণ দিচ্ছেন যার সততার ওপর উম্মতে মুসলিমার 'ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। তাই অদ্ভুত মনে করে মেনে নিতে হবে।

তেমনি একটি কাহিনী মুহাম্মদ ইবনে রাফে (রহ.) উল্লেখ করেন, যিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসায়ী, আবু যুরআর মত শীর্ষ মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ ও শায়খ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি খচ্চর সমপরিমাণ একটি আঙুরের গুচ্ছ দেখেছি। অনুরূপ দশাধিক বিস্ময়কর কাহিনী শায়খ (রহ.) ভূমিকায় লিখেছেন। অতঃপর বলেছেন, যেমনি এই সকল কাহিনী আশ্চর্যজনক হওয়া সত্ত্বেও মেনে নিতে হয় যে, তা বিশুদ্ধ। তেমনি আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কিরামগণ ইলম অর্জন করতে গিয়ে যে সকল মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন তার ওপর ধৈর্যধারণের বিস্ময়কর কাহিনীগুলোকেও মেনে নিতে হবে।"

ইলম অর্জন করতে গিয়ে পূর্বসূরিদের কুরবানীর কিছু নজির :

ইসলাম ধর্ম সর্বপ্রথম ইলমেরই শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) কে ইলম দান করেছেন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সর্ব প্রথম ইলমের ওহী নাযিল হয়েছে। তার প্রভাব এই হলো যে, উম্মতের সকল সদস্য ইলমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) বলেন, আমাদের উত্তরসূরি উলামায়ে কিরামের অধিকাংশ দারিদ্র্যের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এই দারিদ্র্য তাদের ইলম অর্জনের জন্য কখনো প্রতিবন্ধক হতো না। তাঁরা কখনো কারো সামনে নিজেদের প্রয়োজন তথা অভাবের কথা প্রকাশ করতেন না।

তাঁরা ইলমের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক মুসিবত এবং বিপজ্জনক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন এবং এমন ধৈর্য ও নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, তাঁদের শক্তি ও সহনশীলতার সামনে স্বয়ং ''সবর'' অস্থির ও বেকরার হয়ে যায়।

এই দারিদ্র্য নিয়ে তারা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকতেন। সদা কৃতজ্ঞতা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁদের কুরবানী তাঁদেরকে পৃথিবীতে আলোকিত করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক তালেবে ইলমের জন্য উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছে।সব কিছু কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহর খিদমত ও আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য করেছিলেন।

তাঁদের কুরবানী দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোজন ও সংকলন সবুজ-শ্যামল নদীর তীরে অথবা বৃক্ষের ছায়ায় বসে সম্পাদন করা অসম্ভব। বরং এই কাজটি কলিজার তাজা রক্তের বিনিময়ে সম্ভব হয়েছে। এর জন্য অসহনীয় প্রচণ্ড গরমের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। রাতারাতি মিটমিট বাতির নিচে রাত্রজাগরণ করতে হয়েছে। বরং ইলম অর্জন করার রাহে আপন প্রিয় জীবন উৎসর্গ করাকে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে করতেন না। আসুন, আমরা তাঁদের চেষ্টা-কোশিশ ও মেহনত-মোজাহাদার কিছু দৃষ্টান্ত আলোচনা করি, যেন এই রাস্তার ওপর চলা আমাদের জন্যও সহজ হয়ে যায়।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যিনি মুফাসসিরে কুরআন নামে পরিচিত। তিনি কোনো মেহনত ও মোজাহাদা ছাড়া এমনিতেই পবিত্র কুরআনের বড় মুফাস্সির হয়ে যাননি। বরং অত্যন্ত মেহনত ও কঠোর পরিশ্রমের পরই মুফাসসির হয়েছেন। তিনি নিজেই বর্ণনা দিচ্ছেন, ''হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি সাহাবায়ে কিরামগণ থেকে জিজ্ঞাসা করতাম, এবং হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতাম। আমি কখনো খবর পেতাম যে, অমুক সাহাবীর নিকট হাদীস রয়েছে, ঠিক তখনই আমি তার বাড়িতে ছুটে যেতাম। সেখানে গিয়ে যদি জানতাম তিনি বিশ্রাম করছেন, তখন আমি চাদর গুটিয়ে তার দরজার সামনে শুয়ে যেতাম। দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত পরিবেশে ধূলিকণা উড়ে আমার ওপর এসে জড়ো হতো। ঘরের মালিক বের হয়ে আমাকে দেখলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, হে আল্লাহর রসূলের চাচাতো ভাই, আপনি কেন এসেছেন? আপনি কেন এত কষ্ট করেছেন? কাউকে পাঠিয়ে আমাকে কেন ডেকে পাঠাননি? আমি বলতাম, না জনাব, আমাকেই আসতে হবে, অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস জেনে নিতাম। (সবর ওয়া ইসতিকামাত, পৃষ্ঠা-৫০)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

উদীয়মান কাফেলা

"জানাযার নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ ও মুনাজাত" একটি পর্যালোচনা

পূব প্রকাশিতের পর:

এক :

عن ابى هريرةؓ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ـ (سنن ابى داؤد ٢/٤٥٦، باب الدعاء للميت، ابن ماجه شريف ١٠٧ باب ماجاء في الدعاء فى الصلاة على الجنازة ، مشكوة شريف ١/٥٢٧ (المكتب الاسلامى)

তাদের অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযা পড় অতঃপর তার জন্য খাস দু'আ করো।

দুই.

زيد وجعفر لما استشهد ا بموتة على مافى مغازى الواقدى حدثنى محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة وحدثنى عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن ابى بكر قالا : لما التقى الناس بموتة جلس رسول الله ﷺ على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال عليه السلام : اخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى استشهد وصلى عليه ودعا له وقال: استغفروا له دخل الجنة وهو يسعى ثم اخذ الراية جعفر بن ابى طالب فمضى حتى استشهد فصلى عليه رسول الله ﷺ ودعا له وقال: استغفروا له دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء ـ (فتح القدير ٢/٨١)

তাদের অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) মুতার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করার পর নবীজি (সা.) মদীনা শরীফে তার জানাযার নামায পড়ে সাহাবাগণকে বললেন, তোমাদের ভাই যায়েদ বিন হারেছার জন্য দু'আ করো, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। হযরত জাফর (রা.) শহীদ হলে হুজুর (সা.) মদীনা শরীফে তাঁর জানাযা পড়ালেন এবং সাহাবাগণকে বললেন, তোমাদের ভাই জাফরের জন্য দু'আ করো। কেননা সে শহীদ হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে। (ফাতহুল ক্বাদীর ২/৮১)

তিন .

وعبد الله بن سلامؓ فاتته الصلاة على جنازة عمرؓ فلما حضر قال: ان سبقتمونى بالصلاة عليه فلا تسبقونى بالدعاء ـ (المبسوط للسرخسى ٢/٦٧)

তাদের অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর জানাযার পর উপস্থিত হলে বললেন, তোমরা জানাযার নামায পড়ে ফেলেছ কিন্তু আমার পূর্বে দু'আ করো না। অর্থাৎ আমাকে সাথে নিয়েই দু'আ করো। (মাবসুত ২/৬৭)

চার.

عن ابراهيم الهجرى قال رأيت ابن ابى اوفى وكان من اصحاب الشجرة ماتت ابنته (الى ان قال) ثم كبر عليها اربعا ثم قام بعد ذلك قدر ما بين التكبيرين وقال : رأيت رسول الله ﷺ كان يصنع هكذا ـ

তাদের অনুবাদ: হযরত ইবরাহীম হিজরী (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আবি আওফা (রা.)-এর একটি মেয়ে ইন্তিকাল করলে তার জানাযা তিনি কিভাবে পড়েছেন তা আমি (ইব্রাহীম) দেখেছি। হযরত ইবনে আবি আওফা (রা.) প্রথমে চার তাকবীরের মাধ্যমে জানাযার নামায আদায় করেন। এরপর তিনি দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে মেয়ের জন্য পৃথক দু'আ করেন। এবং উপস্থিত সকলকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বললেন, জানাযার পর নবীজি (সা.) এরূপেই দু'আ করতেন। আমি স্বয়ং তা দেখেছি। (বায়হাকী শরীফ ৪/৪২)

১নং দলীলের উত্তর:

জানাযার পরে সম্মিলিত দু'আ করার প্রবক্তাগণ উক্ত হাদীসের অনুবাদ করেন "যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ো অতঃপর তার জন্য খাস দু'আ করো।" এমন অনুবাদ সঠিক নয়। বরং হাদীসটির বিশুদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ক. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় "সুনানে আবু দাউদ" শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল মানহালুল আযবুল মাউরুদ এর ৯মখণ্ড ৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

اى اجعلوا له الدعاء خالصا مقصودا به وجه الله تعالى سواء كان الميت محسنا ام مسيئا فان العاصى احوج الناس الى دعاء اخوانه المسلمين وافقرهم الى شفاعتهم ولذا قدم بين ايديهم للشفاعة له ولا يكون الاخلاص الا بصفاء الخاطر عن الشواغل الدنيوية بالخضوع بالقلب والجوارح ـ

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে দু'আ করো। চাই সে নেককার হোক বা গোনাহগার হোক। কেননা, গোনাহগার ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইদের নিকট থেকে দু'আ ও সুপারিশ পাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য মানুষের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষী। এজন্যই তো তাকে মৃত্যুর পর তাদের সামনে রেখে সুপারিশ ও দু'আ করা হয়। আর ইখলাস ও কায়মনোবাক্যে দু'আ করার পূর্ব শর্ত হলো , মানুষ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আত্মার স্থিরতার সাথে সাথে অন্তরকেও দুনিয়াবী বিভিন্ন ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রাখবে।

খ. অপর এক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ

"বযলুল মাজহুদ" এর ১৪তম খণ্ড ১৭০ নং পৃষ্ঠায় হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

ای اجعلوا له الدعاء بالاخلاص التام

"পূর্ণ ইখলাসের সাথে তার জন্য দু'আ করো।

গ. যদি আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানাযার নামাযের পরের দু'আই উদ্দেশ্য হতো তাহলে হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ তা করতে নিষেধ করতেন না। অথচ মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) কর্তৃক এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। যা কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ইবনে মালেক (রহ.) থেকে এই হাদীসের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেন–

ویمکن ان یکون معناه اجعلوه له الدعاء خالصا فی القلب وان کان عاما فی اللفظ الخ

"মৃত ব্যক্তির জন্য অন্তর থেকে খালেসভাবে দু'আ করো, যদিও বা দু'আর শব্দগুলো সকলের জন্য। আর এটি জানাযার নামাযে পঠিত দু'আ, যা সমস্ত মুসলমানদের শামিল করে নেয়।

ঘ. যদি উক্ত হাদীসের فاخلصوا শব্দের فاء تعقیب এর কারণে "অতঃপর তার জন্য খাস দু'আ করো।" এমন অনুবাদ করা হয়। তাহলে–

اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم الخ

আয়াতটির অনুবাদ হতে হবে "নামাযে দাঁড়িয়ে অজু করো।" তদ্রুপ اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الخ আয়াতটির অনুবাদ হতে হবে "কুরআন তেলাওয়াত শেষে আউযু বিল্লাহ পড়ো।" অথচ এমন অনুবাদ ভুল ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। বিধায় "অতঃপর তার জন্য খাস দু'আ করো" এমন অনুবাদও সঠিক নয়।

হাদীসটির বিশুদ্ধ অনুবাদ : মুজাহেরে হক ২/৫৪–

اور روایت ہے ابوھریرۃؓ سے کہ کہا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس وقت کہ پڑھو تم نماز میت پر پس خالص کرو اسکے لئے دعاء یعنی کسی کے دکھانے سنانیکا خیال نہو خالص اللہ ہی کی خوشنودی مدنظر ہو اور دل سے دعا کرو۔

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে, তখন তার জন্য দু'আ বিশেষভাবে করো। অর্থাৎ কাউকে দেখানোর জন্য নয় বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার জন্য অন্তর দিয়ে দু'আ করো।"

ঈযাহুল মিশকাত ২/৪৩৬ এ আছে-

جس وقت تم میت پر نماز پڑھو گے تو اسکے لئے دعا کو خالص کرو۔

حدیث الباب کے معنی یہ ہے کہ اذا اردتم الصلاة علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔

"যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে তখন মৃতব্যক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে দু'আ করো।"

ঙ. উক্ত হাদীসে উল্লেখিত দু'আর দ্বারা জানাযার নামাযে পঠিত দু'আই উদ্দেশ্য। জানাযার পরের দু'আ নয়। কারণ ইবনে মাজাহ শরীফের ১০৭ নং পৃষ্ঠায়

باب ماجاء فی الدعاء فی الصلاة علی الجنازة

"জানাযার নামাযে পঠিতব্য দু'আ" শিরোনামের অধীনে হাদীসটি উল্লেখ আছে। যার দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, জানাযার দু'আর পদ্ধতি বর্ণনা করাই এই হাদীসের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জানাযার দু'আ কায়মনোবাক্যে পাঠ করো। আর দু'আটি কি হবে তা এই অধ্যায়েই পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার ভাষ্য হচ্ছে–

کان رسول اللہ ﷺ اذا صلی علی جنازة یقول اللهم اغفر لحینا ومیتنا الخ

"দ্বিতীয় হাদীসে প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে, খালেসভাবে যে দু'আটি করতে হবে, তা জানাযার নামাযে পঠিত দু'আ। জানাযার পরের কোনো দু'আ এখানে উদ্দেশ্য নয়।"

অতএব "জানাযার নামাযে পঠিতব্য দু'আ" শিরোনামের অধীনে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা জানাযার পরের দু'আ প্রমাণের কোন অবকাশ নেই।"

৭. "আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠায়–

باب الدعاء فی صلاة الجنازة

"জানাযার নামাযে পঠিতব্য দু'আ" শিরোনামের অধীনেও আলোচ্য হাদীসটি আনা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতেও উক্ত হাদীসে الدعاء শব্দটির দ্বারা ওই দু'আই উদ্দেশ্য যা জানাযার নামাযে পড়া হয়।

ছ. الدعاء "দু'আ" শব্দটিতে আলিফ লামের সংযুক্তি আরবী ব্যাকরণ নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত দু'আর কথাই বোঝায়। আর জানাযার নামাযে নির্ধারিত দু'আ শুধু সেটিই যা তৃতীয় তাকবীরের পরে পড়া হয়। জানাযার পরে দাফনের পূর্বে দু'আ করাকে ফেকাহবিদগণ নিষেধ করেছেন। সুতরাং الدعاء দু'আ শব্দটির সত্যায়ন কখনও জানাযার পরের দু'আ হতে পারে না। বরং ওই দু'আই যা শরীয়তের আলোকে নির্দিষ্ট ও আইম্মায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত।

২ নং দলীলের উত্তর :

ক. ফতহুল ক্বদীর এর ২য় খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে:

وهذا مع ضعف الطرق فما فی المغازی مرسل من الطریقین ومافی الطبقات ضعیف بالعلاء وهو ابن زید ویقال ابن زید اتفقوا علی ضعفه وفی روایة الطبرانی بقیة بن الولید وقد عنعنه۔

আলোচ্য হাদীসটি হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় "মুরসাল" ও "জয়ীফ"। কারণ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে ওয়াকেদী এবং বাকিয়্যা ইবনে ওয়ালীদ এর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। সুতরাং এমন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা কিভাবে সঠিক হবে? তদুপরি হাদীসের বর্ণনাকারী ওয়াকেদী এর বর্ণিত হাদীস আহকামের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই হুকুমের ব্যাপারেও আলোচ্য হাদীস দলিল হতে পারে না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

-আরিফুল হক সিদ্দিক

তারানা

করুণা

মুহাম্মদ নাবীউল ইসলাম

আমি মহাপাপী দাও প্রভু ক্ষমা
তোমার করুণা চাই।
তুমি অসীম আমি যে সসীম
গোনাহের সীমা নাই।
অবিরত কতশত ভুল
হয়েছে আমার দ্বারা।
ভাসে দুই আঁখি,
তোমাকে ডাকি
আমি আজ দিশেহারা।
একা তুমি যে, দেখ
কালিমা মুখে পরম সুখে
আমার মরণ রেখ।

প্রিয় রসূল (সা.)

উবাইদুল্লাহ তারানগরী

রসূল তুমি সবার প্রিয়
তোমায় ভালোবাসি
তাই তো আমি তোমায় নিয়ে
ছড়া, কবিতা লিখি।
রসূল তুমি দু'জাহানে
সব মানুষের সেরা।
উম্মতেরি লাগি তুমি
সদা পাগলপরা।
রসূল তুমি করলে দূর
সকল আঁধার কালো।
বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে দিলে
আল কুরআনের আলো।
তোমার দ্বারা দূর হয়েছে
ঘোর অমানিশা
তোমা থেকে উম্মত পেয়েছে
সত্যের দিশা।

মাহে রমাজান

এম জহিরুল ইসলাম

মা- মাসের মধ্যে ভাই সব সেরা
আসছে মাহে রমাজান।
হে- হেলায় খেলায় তুমি কাটিও না দিন
প্রস্তুতি নাও করতে সিয়াম সাধন।
র- রসূলের করা দু'আর পঠন
সর্বক্ষণ করো হে বন্ধুগণ।
ম মহান মালিকের হুকুম করতে পালন
বল বাল্লিগনা রমাজান।
জা জাগিয়ে তোলো ঘুমন্তদের
এখনো যারা অচেতন।
ন নর-নারীর পাশবিক শক্তি করতে দমন
আগমন করছে মাহে রমাজান।

দুটি ফুলের একই ঘ্রাণ

মুহাম্মদ আব্দুল হাই বাহুবলী

শায়খুল হিন্দ (রহ.) আর মাদানী (রহ.)
দুটি ফুলের একই ঘ্রাণ
দ্বীনের মশাল জ্বালিয়ে গেলেন
জ্বলে সদা অনির্বাণ।
একই সাথে বহুগুণে
ছিলেন তাঁরা বিদ্যমান।
দ্বীনের রাহে অকাতরে
বিলিয়ে দিলেন ধন ও প্রাণ।
জেলজুলুম আর কারাবরণ
চলছিল বিরামহীন।
তবুও ইংরেজ বেনিয়ার মোকাবিলায়
লড়াই ছিল আপসহীন।
দিনের বেলায় দরস দিতেন হাদীসে রসূল
রাত্রি বেলায় যিকরুল্লাহ।
তাঁদের রাহে চালাও মোদের
হে মা'বুদ আল্লাহ।

নীল আকাশের চাঁদ

(উস্তাযে মুহতারাম ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর খিদমতে)

মুহাম্মদ আব্দুল হাই বাহুবলী

মুফতিয়ে আজম তুমি,
ফক্বীহে মিল্লাত তুমি
তুমি নীল আকাশের চাঁদ।
তোমায় দেখলে মিটে মোদের
আকুল প্রাণের স্বাদ।
শামসুল উলামা তুমি,
মুহিউসসুন্নাহ তুমি
দ্বিধা করো না তুমি
করতে অন্যায়ের প্রতিবাদ।
প্রতিবাদী কণ্ঠ তুমি
প্রতিরোধ করতে
ফিরকায়ে বাতেলার,
তুমি আদর্শের প্রতীক
দেওবন্দী কাফেলার।
তুমি যে সদা নিবেদিত প্রাণ
তোমার স্মৃতি যেন থাকে অম্লান।
প্রভুর কাছে মোরা সবাই
করি মোনাজাত
দরাজ করেন তিনি যেন
তোমার আলোকময় হায়াত।

আল-আবরার

জুনায়েদ তাহের চাটগামী

আ- আজ সত্যান্বেষী বীর যোদ্ধার বিজয় চূড়ান্ত
উদিত হয়েছে তিমির গগণে নতুন দিগন্ত।
ল- লক্ষ বাধা ছিন্ন করে বিপ্লবী সংগ্রাম
মুহিউসসুন্নাহ শাহ আবরারের রূহানী পয়গাম।
আ- আল আবরার মুক্তিকামী উম্মাহর রাহবার
হক্ব বাতিলের রণাঙ্গনে নির্ভীক দুর্বার।
ব- বক্র যুগে সুনিদর্শন সত্যের প্রেরণা
ভ্রষ্টতাকে হটিয়ে দিয়ে দুর্জয় সূচনা।
রা- রাত আঁধারে আলোক মশাল হকের বার্তা বাহক।
আল-আবরার মানব জীবনের সুষ্ঠু পরিচালক।
র- রত্নতুল্য জ্ঞানভাণ্ডার, দ্বীনের বার্তা নিয়ে
আল-আবরার এল ধরায় জ্ঞানের প্রদীপ হয়ে।

খবরাখবর

টেকনাফের ঐতিহাসিক ইমাম সম্মেলনে
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান
নবীজির সুন্নাত থেকে দূরে সরার কারণেই সর্বত্র অশান্তি বিরাজমান

হাফেজ মুহাম্মদ কাশেম, টেকনাফ থেকে :

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পৌরসভা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ৬ জুন অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ইমাম সম্মেলনে মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ, ফক্বীহুল মিল্লাত মাওলানা মুফতি আব্দুর রহমান বলেছেন, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতি নিয়ম হলো মাছের শান্তি পানির ভেতর, আর মানুষের শান্তি নবীজির সুন্নাতের ভেতর। সেই মহান সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আজ সর্বত্রই অশান্তি বিরাজমান। তিনি দুনিয়া আখেরাতের শান্তি প্রত্যাশী সকল আলেম-ওলামা ও সাধারণ মুসলমানকে সর্বক্ষেত্রে নবীজির সুন্নাত পালন করার আহবান জানান। তিনি কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, নবীজির সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপন করলে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল স্তরে জান্নাতি পরিবেশ পরিলক্ষিত হবে।

সম্মিলিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ঐতিহ্যবাহী বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব হুজুরের ভক্ত-অনুরক্তদের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন জামে মসজিদের প্রায় ৮ শতাধিক ইমাম-খতিব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। টেকনাফ জামিয়া প্রধান, দৈনিক সাগরদেশ ও মাসিক আল-আবরার সম্পাদক মাওলানা মুফতি কিফায়তুল্লাহ শফিক-এর পরিচালনায় প্রায় ৮ ঘণ্টাব্যাপী উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন- মুহিউস্ সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলিফা ও বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের সম্মানিত মুফতি ও মুহাদ্দিস মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ সোহাইল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হীলা জামিয়া দারুস সুন্নাহর নির্বাহী মুহতামিম মাওলানা আফসারুদ্দীন কাসেমী, সাবরাং দারুল উলুম মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম মাওলানা আমীর হোছাইন, শাহপরীরদ্বীপ বাহরুল উলুম জামিয়ার মুফতী নূরুল ইসলাম, জামিয়া ফারুকিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা মাহবুবুর রহমান মজাহেরী, লেঙ্গুরবিল জামিয়া এমদাদিয়ার নায়েবে মুহতামিম আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ আকবর, বড় ডেইল ফয়জুল উলুম মাদ্রাসার আলহাজ্ব মাওলানা নূরুল বশর, টেকনাফ মদিনাতুল উলূম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ শফি, মা'হাদ ইবনে মাসউদ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক মুহতামিম আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ রিজওয়ান, সেন্টমার্টিন রহমানিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল ইসলাম, সেন্টমার্টিন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ আবুল হোছাইন, হীলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী ফরিদুল আলম, চৌধুরীপাড়া জামিয়া আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা হাফেজ মুখতার হোছাইন, শামলাপুর আনাস বিন মালেক মাদ্রাসার মুহতামিম আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুদ্দীন, নোয়াখালী দারুল উলূম মাদ্রাসার মাওলানা আবুল মঞ্জুর, টেকনাফের প্রবীণ সাংবাদিক মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ কাশেম প্রমুখ।

সম্মেলন শেষে মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল মুসলিম নর-নারীর মাগফিরাত কামনায় হযরত ওয়ালা মুফতি সাহেব হুজুর (দা:বা:) অশ্রুসজল মুনাজাত শুরু করলে বিশাল মসজিদের ভেতরে-বাইরে কান্নারত অসংখ্য মুসল্লিদের মধ্যে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পবিত্র মাহে রমাজানে
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরায়
ইসলাহী ইজতিমা, নাহু-সরফ ও ফেরাকে বাতেলা সম্পর্কিত তাদরীবী কোর্স
যথারীতি পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ

চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের এই যুগে মুসলিম উম্মাহ অতিক্রম করছে এক মহা ক্রান্তিকাল। পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদি যেন এখন সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এর ফলে মুসলিম উম্মাহের সর্বমহলে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক অস্থিতিশীলতা। এসব কারণে উম্মতের কর্ণধার উলামায়ে কেরামের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে বহুবিদ পেরেশানি।

এই নাজুক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুহিউসসুন্নাহ হযরত শাহ মুহাম্মদ আবরারুল হক সাহেব হারদূয়ী (রহ.)-এর প্রখ্যাত খলীফা হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম) ১৬ বছর পূর্ব থেকে পবিত্র মাহে রমাজানে ১৫ দিনব্যাপী ইসলাহী ইজতিমা আয়োজন করে আসছেন। প্রতিবছর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশিষ্ট উলামায়েকেরাম এবং হযরতের বাইয়াতকৃত ওলামায়ে কেরাম এই ইসলাহী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এ বছর ১ম রমজান থেকে ১৫ রমজান পর্যন্ত এই ইসলাহী ইজতিমার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য ভারতের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, বিশিষ্ট মোনাযির হযরত মাওলানা মুফতী মাসূম সাহেব (দা.বা.) কে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

মারকাযে ২২ বছর থেকে চলে আসা নাহু, সরফ এবং ফেরাকে বাতেলার ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স আরো ব্যাপকভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। যেন ছাত্রগণ নাহু সরফে বিশেষ পারদর্শিতা ও সঠিক জ্ঞানের আলোকে নতুন নতুন সৃষ্ট বাতিল ফিরকার মোকাবেলা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়।

তাসহীহে কুরআনের প্রশিক্ষণ কোর্সও এ বছর নতুন আঙ্গিকে পরিচালনার নিমিত্তে দশজন অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।